চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়

খুজুটীপাড়া ❋ বীরভূম



প্রতীতি

বার্ষিক পত্রিকা

২০২৪ - ২০২৫





AC STUDENTS'
COMPUTER LAB



AC STUDENTS' STUDY HALL

প্রতীতি

বার্ষিক পত্রিকা : ২০২৪-২০২৫
চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়
ফোন- ৯৪৭৪৬১৪৬৪৪

Website: www.chandidasmahavidyalaya.ac.in

সম্পাদনায় :
ড. মহঃ আলমগীর খান

সহ সম্পাদনায় :
অধ্যাপক ঋত চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক ড. রতনেশ্বর আচার্য্য
অধ্যাপিকা ড. সামসুন নিহার
অধ্যাপক আনোয়ারে মুর্শিদ

প্রকাশনা :
চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়
খুজুটীপাড়া, বীরভূম

প্রচ্ছদ :
অধ্যক্ষ ড. সেখ আতাউর রহমান

কলেজ পরিচালনায় যাঁরা আছেন :-

১। শ্রী বিধান চন্দ্র মাঝি	-	সভাপতি
২। ড. সেখ আতাউর রহমান	-	অধ্যক্ষ, সম্পাদক
৩। ড. মোজাফর হোসেন মণ্ডল	-	উচ্চতর শিক্ষা সংসদ প্রতিনিধি
৪। জনাব আব্দুল কেরিম খান	-	সরকার প্রতিনিধি
৫। ড. কৌশিক ঘোষ	-	সরকার প্রতিনিধি
৬। ড. হীরা মুখোপাধ্যায় ঘোষ	-	বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত
৭। ড. বৈরাম খান	-	বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত
৮। ড. সুদীপ নারায়ণ মৈত্র	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৯। ড. মহঃ আলমগীর খান	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
১০। ড. অনুপ কুমার রানো	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
১১। শ্রী সিঞ্চন কুমার ব্যানার্জী	-	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
১২। কামরুল সিদ্দিকী	-	ছাত্র প্রতিনিধি (তদারককারী সংসদ)

অধ্যাপক - অধ্যাপিকামণ্ডলী

অধ্যক্ষ	-	অধ্যাপক ড. সেখ আতাউর রহমান।
বাংলা বিভাগ	-	অধ্যাপিকা ড. সুতপা পাল, অধ্যাপিকা সুস্মিতা সেন দাস, অধ্যাপক ড. নিরঞ্জন মুখার্জ্জী, অধ্যাপিকা ড. সামসুন নিহার, অধ্যাপক আনোয়ারে মুর্শিদ।
ইংরাজী	-	অধ্যাপিকা অভিনন্দা চক্রবর্তী, অধ্যাপক ঋত চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা বিশাখা স্যাণ্ডেন, অধ্যাপিকা নিখাত ইয়াসমিন, অধ্যাপিকা রেশমী খাতুন।
সংস্কৃত বিভাগ	-	অধ্যাপক ড. কৌশিক রায়, অধ্যাপক ড. অনুপ কুমার রানো, অধ্যাপক ড. রতনেশ্বর আচার্য্য, অধ্যাপিকা ছন্দা ঘোষ, অধ্যাপিকা রানু রায়।
ইতিহাস বিভাগ	-	অধ্যাপক সুমন পাত্র, অধ্যাপিকা মৌসুমী রায়চৌধুরী, অধ্যাপক ড. সুদীপ নারায়ণ মৈত্র, অধ্যাপিকা তাপসী মৈত্র, অধ্যাপক দেবব্রত নন্দী।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ	-	অধ্যাপক ড. সুভাষ সিংহ রায়, অধ্যাপক করণ ভোরা, অধ্যাপক আজিজ হাসান, অধ্যাপক কাফিউল্লাহ, অধ্যাপক মহঃ হেফজুল্লাহ, অধ্যাপক সেখ মিনহাজউদ্দিন।
ভূগোল বিভাগ	-	অধ্যাপক ড. কৌস্তুভ মুখার্জ্জী, অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ মন্ডল, অধ্যাপক মানবেন্দ্র রায়, অধ্যাপক অরিজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক মহঃ সাহিদুল ইসলাম।
দর্শন বিভাগ	-	অধ্যাপক বরুন বল, অধ্যাপক ড. বৈকুণ্ঠনাথ পাল, অধ্যাপক সঞ্জীব রুইদাস, আমন্ত্রিত অধ্যাপক অনুজ বাগ, আমন্ত্রিত অধ্যাপক সাহির সোয়েল।

অধ্যাপক - অধ্যাপিকামন্ডলী

অর্থনীতি বিভাগ	-	VACANT
সঙ্গীত বিভাগ	-	VACANT
পদার্থবিদ্যা বিভাগ	-	অধ্যাপক ড. কিরণময় মন্ডল।
রসায়ন বিভাগ	-	অধ্যাপক ড. রিমা দাস।
গণিত বিভাগ	-	অধ্যাপিকা ড. সাবিনা ইয়াসমিন, অধ্যাপিকা ড. উপাসনা সামন্ত, অধ্যাপক ড. বিপত্তারন রাজ, অধ্যাপক ভাস্কর মন্ডল, অধ্যাপক অর্ঘ্য ঘোষ।
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ	-	অধ্যাপক ড. সায়ন্তন ব্যানার্জ্জী।
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ	-	অধ্যাপক ড. শুভজিৎ মন্ডল।
বাণিজ্য বিভাগ	-	অধ্যাপিকা ড. হোমায়রা সিদ্দিকা, অধ্যাপক তাপস কুমার মন্ডল।
গ্রন্থাগার বিভাগ	-	ড. মহঃ আলমগীর খান।



TEACHING STAFF OF THE COLLEGE

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১। শ্রী জনার্দন দাস	-	গাণনিক
২। চৌধুরী আমির আমজাদ	-	করণিক
৩। শ্রী তপন কুমার দাস	-	করণিক
৪। মহঃ ইউসুফ	-	লাইব্রেরী করণিক
৫। শ্রী বুদি কিস্কু	-	ল্যাব এটেনডেন্ট (পদার্থবিদ্যা)
৬। শ্রীমতী প্রতিমা সাহা	-	লেডি এটেনডেন্ট
৭। মহঃ ইব্রাহিম	-	লাইব্রেরী পিয়ন
৮। শ্রী সমরেশ দাস	-	ল্যাব এটেনডেন্ট (জিওগ্রাফি)
৯। শ্রী সিঞ্চন কুমার ব্যানার্জী	-	ইলেকট্রিশিয়ান
১০। শ্রী সূর্য হাঁসদা	-	ল্যাব এটেনডেন্ট (বায়োলজি)
১১। শ্রী নবকুমার থান্দার	-	নৈশ প্রহরী



NON-TEACHING STAFF OF THE COLLEGE

পত্রিকা সম্পাদকমন্ডলী

১। অধ্যাপক ড. সেখ আতাউর রহমান

২। ড. মহঃ আলমগীর খাঁন

৩। অধ্যাপক ঋত চট্টোপাধ্যায়

৪। অধ্যাপক ড. রতনেশ্বর আচার্য্য

৫। অধ্যাপিকা ড. সামসুন নিহার

৬। অধ্যাপক আনোয়ারে মুর্শিদ

৭। শ্রী তপন কুমার দাস

৮। কামরুল সিদ্দিকী

Bidhan Chandra Majhi
Member of West Bengal Legislative Assembly
Identity No. 17LA/287

Vill. : Chandidas Nanoor
Dist. : Birbhum
Mob.: 9733744076/
9382385791

Ref. No. .....

Date .....

'প্রতীতি' চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ের এক সৃজনশীল প্রয়াস। পড়াশোনার পাশাপাশি নানারকম সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনন চর্চার একটা সুন্দর পরিসর আমাকে মুগ্ধ করে। 'প্রতীতি' সেই চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছাত্র-ছাত্রীদের মনন চর্চার মাধ্যম হল 'প্রতীতি'।যে সকল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার দ্বারা পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের প্রত্যেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। এছাড়াও কয়েকটি টুকরো টুকরো পাণ্ডুলিপিকে যারা পত্রিকায় রূপদান করেছেন তাদের জানাই সম্মান।বার্ষিক এই পত্রিকা প্রকাশের সংবাদে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

Bidhan Chandra Majhi

President
CHANDIDAS MAHAVIDYALAYA
P.O.- Khujutipara, Dist.- Birbhum

The University of Burdwan
Rajbati, Burdwan
West Bengal - 713104

Prof. (Dr.) Sankar Kumar Nath [Shanti Swarup Bhatnagar Laureate]
Ph. D., D.Sc.(hc), FNAE, FNASc, FAScT, FISSA, FIGU
Vice Chancellor

No. V/M-4/94

Dated 1st April, 2026

M E S S A G E

I am happy to know that Chandidas Mahavidyalaya, Khujutipara, Birbhum is going to publish its annual college magazine *'PRATEETI' – 2025.*

I wish the publication of the magazine a grand success.

Prof. (Dr.) Sankar Kumar Nath
Vice Chancellor
The University of Burdwan

Dr. Sk. Ataur Rahaman
Principal
Chandidas Mahavidyalaya
Khujutipara, Birbhum-731215

Mob : 9734634942, 9002809668
E-mail : vc@buruniv.ac.in & nathsankarkumar@gmail.com

বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়
BISWA BANGLA BISWABIDYALAY
Shibpur, Bolpur, Birbhum - 731204
West Bengal, INDIA
Tel. No.: +919435118593
E-mail: vc@bbb.ac.in

Prof. Dr. Abu T. Khan
Vice-Chancellor

No.: BBB/VC/35/2026

Date: 18th April 2026

MESSAGE

It gives me immense pleasure to learn that Chandidas Mahavidyalaya, under the University of Burdwan, is bringing out the Annual Magazine, **PRATITI**, for the session 2024-2025.

This College Magazine is not merely a publication; it is a reflection of the creativity, intellectual ability, and aspirations of students, teachers, and staff members. It provides a valuable platform for young minds to express their views, opinions, and intuitive thoughts, as well as share innovative ideas.

I extend my heartfelt greetings and best wishes to the teachers and students, as well as to those directly associated with the publication of the Magazine.

I wish the publication of the Magazine great success.

With best regards,

Sincerely yours,

A T Khan 18.04.2026

(Prof. Abu T. Khan)
Vice-Chancellor

Vice- Chancellor
Biswa Bangla Biswabidyalay
Bolpur, Birbhum, W.B

অধ্যক্ষের কলমে

অন্যান্য বছরের ন্যায়ে ধারাবাহিকতার সরণি বেয়ে এবছরও প্রকাশিত হলো কলেজের বার্ষিক পত্রিকা ‘‘প্রতীতি’’ । পরম্পরা অনুযায়ী ফিরে ফিরে আসে একদল শিক্ষার্থীর আগমন, বিপরীত ক্রমে একদলের বিদায়। এই চিরন্তনী ধারার মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় কিছু কাব্যকথা। আর এই সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা তার বীজাকারে প্রতিভার স্ফুরন ঘটিয়ে মেতে ওঠে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। বিগত কয়েকটি বছরে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অনবদ্য লেখনীর দ্বারা পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করেছে। আজকের পত্রিকা প্রকাশের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সেইসব ছাত্র-ছাত্রী, যাদের লেখা এই পত্রিকায় স্থান লাভ করছে তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশ একটি চিরন্তন প্রয়াস বলা যেতে পারে। পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক মন্ডলীকে আমার হার্দিক অভিবাদন জ্ঞাপন করি, কেননা লেখা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিক সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করা এবং নিয়মিত ভাবে মুদ্রণের বিষয়ে তৎপরতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পত্রিকার মধ্যে কলেজের বিবিধ বিষয় সূত্রাকারে পরিবেশিত হয়েছে। আমাদের কলেজে নিয়মিত শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি NCC, NSS, অত্যাধুনিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন চাকরি কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ, কম্পিউটারাইজ লাইব্রেরীর সর্বাবিধ সুবিধা যা আমাদের কলেজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। ইতিমধ্যে আমরা তৃতীয়বার NAAC পরিদর্শন সম্পন্ন করেছি। চতুর্থ বারের NAAC পরিদর্শনের প্রস্তুতি চলছে। উত্তরোত্তর আমাদের এক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, তবে আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয়, আমার কলেজের মান-মর্যাদা ও কর্মকুশলতা জেলায় বিশেষভাবে সমাদৃত হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির-সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস আমাদের বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলেছে। সাধারণ স্তরের পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রীবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তবে ভরসা রাখি, আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের কলতান ও সারস্বতচর্চায় আমাদের মহাবিদ্যালয় চত্বর পুনরায় মুখরিত হয়ে উঠবে।

পত্রিকা প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রীসহ পরিচালন সমিতির সকল সদস্যবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। সর্বোপরি, সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই, যারা লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত করেছে, তারা জীবন-যুদ্ধে যেন চির অজেয় হয়ে মহাবিদ্যালয়ের মান মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে।

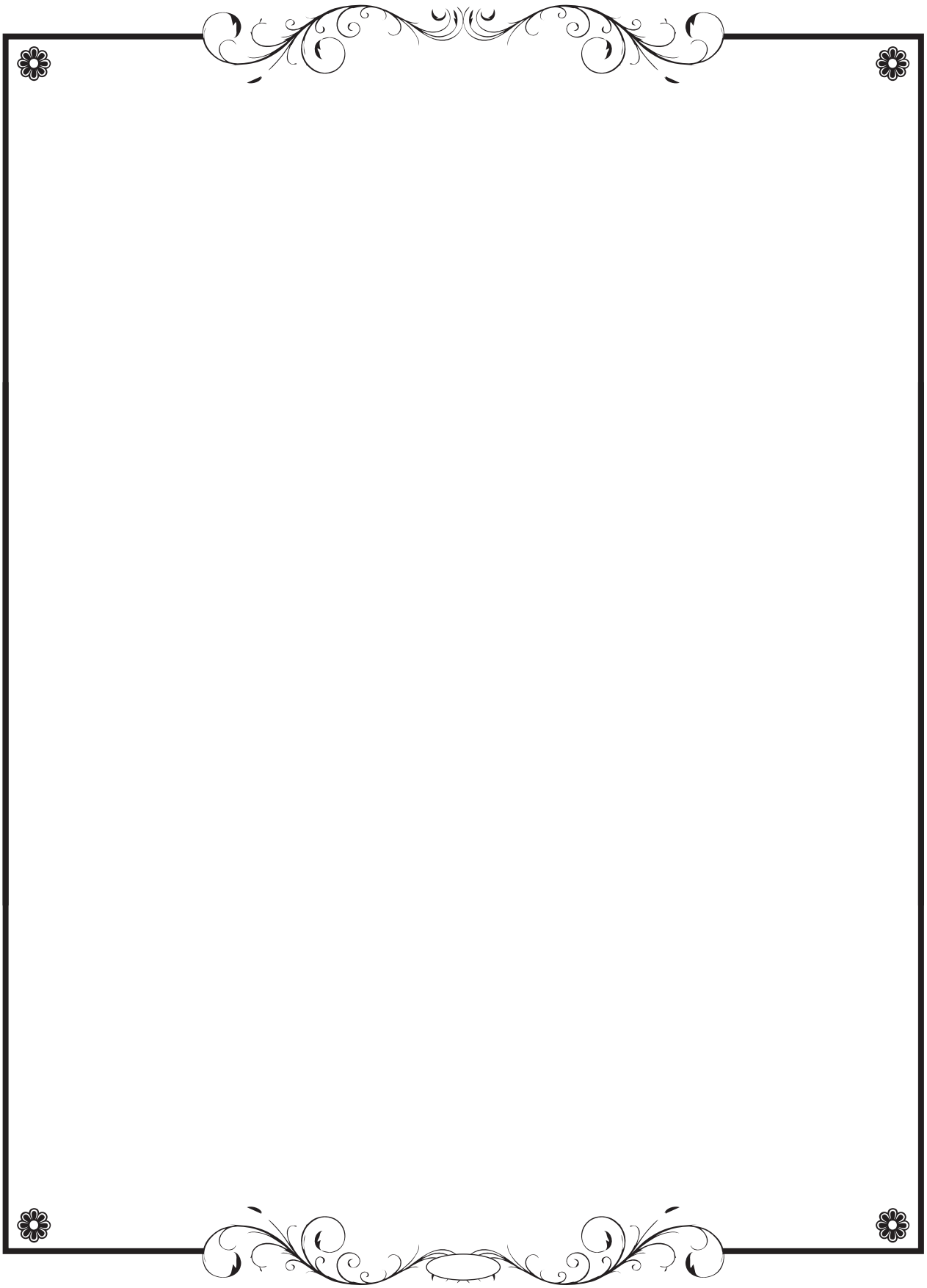
সম্পাদকীয়

শিক্ষাকে বাহন করে তুলতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নিরন্তর চর্চার। সেই চর্চার প্রবাহকে নানা ভাবে বয়ে নিয়ে চলছে মননশীল মানুষেরা। আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা। মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকাও তারই একটা অংশ। যে কোনো মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা সেই মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্র। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল, নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণের ও বিভিন্ন ধরণের আর্থ-সামাজিক স্তরের একঝাঁক যুবক-যুবতীরা এসে মিলিত হয় মহাবিদ্যালয়ের আঙিনায়। নতুন চিন্তা চেতনার আলোকে আলোকিত হয় তাদের মনোজগৎ। জন্ম হয় নতুন চিন্তা ও চেতনার। আর তা থেকেই অঙ্কুরিত হয় সেই ভাবনাকে প্রকাশের বাসনা। মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা তা-দের ভাবনার আধার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা ‘প্রতীতি’ও নতুন প্রজন্মের মনন চর্চার আধার।

বিশ্বজুড়ে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব, দেশেও নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক নানা সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদির মধ্যে থেকেও নতুন প্রজন্ম যে নতুন উৎসাহে সৃজনশীলতায় মেতে উঠছে সেটাই আমাদের আশার আলো দেখায়। এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি । ইতিহাস সাক্ষী অস্থির সময়ই শ্রেষ্ঠ শিল্পের জন্ম দিয়েছে। মানব জীবনে মুঠোফোনের আধিপত্য মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বিচ্ছিন্নতার দীর্ঘশ্বাস ভাষা নিয়ে উঠে এসেছে পত্রিকার পাতায়। সমাজ শৃঙ্খলের বেড়া ভেঙ্গে নারী জাগরণের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে কবিতার আঙ্গিকে। মানুষের জীবনে বইয়ের ভূমিকা ও গুরুত্বের বিশ্লষণে প্রবন্ধের পসরা সাজিয়েছে আমাদের আগামীরা। পাঠাভ্যাসে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং বিশ্ব উষ্ণায়নে মানব সভ্যতার দায়ের কথাকেও তারা গেঁথেছে প্রবন্ধের আঙ্গিকে। স্বাভাবিক ভাবেই লেখাতে পরিপক্কতার অভাব থাকলেও ছাত্রদের লেখার উৎসাহ ও নড়বড়ে প্রয়াসই ‘প্রতীতি’র চলার পাথেয় এবং তাদের লিখতে শেখার অভ্যাসের অবলম্বন। আশা রাখি এই অভ্যাসই তাদের লেখার পরিণতি আনবে।

যাদের লেখার সম্ভারে ‘প্রতীতি’র পাতা সেজে উঠেছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি অশেষ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। পত্রিকার সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা যুক্ত

তাদের প্রত্যেকের প্রতি ‘প্রতীতি’র পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই। শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই সেই সকল ব্যক্তিবর্গকে যাদের উৎসাহ এবং পরিশ্রমে এই পত্রিকা সামগ্রিক রূপ পেয়েছে। আর লেখার টুকরো টুকরো পাতাকে একত্রিত করে ‘প্রতীতি’তে রূপদান করেছে যেসকল মানুষদের কঠিন কায়িক পরিশ্রম তাদের জানাই সম্মান।



–ঃ সূচীপত্র ঃ-

			পৃষ্ঠা
১।	মেয়ে	বিদিশা সামন্ত	০১
২।	আলো যিনি জ্বালান	ইনজামমউল সেখ	০২
৩।	আমাদের নীরবতার দহন	শেখ ইদ মোরারক	০২
৪।	সময়ের স্রোত	প্রিয়া মন্ডল	০৪
৫।	আমার সুখ-দুঃখ	সোনালি পাল	০৬
৬।	Home	Chowdhury Razin Sabib	০৭
৭।	Human Fate	Souvik Ghosh	০৮
৮।	The Quiet Mountains	Keya Pan	০৯
৯।	Season of Love	Soumodeep Ghosal	১০
১০।	Every Morning	Asrina Khatun	১০
১১।	নতুন শিক্ষানীতি	অধ্যাপক সুভাষ সিংহ রায়	১১
১২।	সাসারামের গৌরব : শের শাহ সুরির সমাধি	অধ্যাপক তাপস কুমার মন্ডল	১৬
১৩।	বাল্যবিবাহ : একটি সমাজিক অভিশাপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	মায়শা আফরোজ	১৮
১৪।	বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়নে মানব সভ্যতার ভূমিকা	তনুরা খাতুন	২৫
১৫।	বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ আমাদের দায়িত্ব	প্রণতি ঘোষ	৩০
১৬।	বিশ্বাসে মিলায় বস্তু	জয়তী সাঁতরা	৩২
১৭।	আমার চোখে গ্রন্থাগার	নন্দিনী রায়	৩৩
১৮।	মানসিক বিকাশের উৎস বই	রূপসা খাতুন	৩৬
১৯।	মনন চর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ বই	সাবানা ইয়াসমিন	৩৯

মেয়ে

বিদিশা সামন্ত
দ্বিতীয় সেমিস্টার, গণিত বিভাগ

মেয়ে তুমি একাই লড়ো,
একাই করো জীবনযাপন,
দরকার নেই কোনো পুরুষের হাত,
যদিও সে হয় আপন।

একাই তুমি পারবে সব,
যদি কর চেষ্টা,
নিজের কথায় ওঠো-বসো
ভালো হবে শেষটা।

কোনো কিছুতেই তুমি,
পেয়োনাকো কষ্ট,
পারলে বই পড়ো,
মন হবে শিষ্ট।

আজ যদি ভয় পাও,
সাহসী হবে কবে ?
জাগো নারী আগুন হয়ে,
ভয়ের চিতা ভস্ম হোক তবে।

আলো যিনি জ্বালান

ইনজামমউল সেখ
প্রথম সেমিস্টার, বোটানি বিভাগ

শিক্ষক শিক্ষিকা আমাদের আলোর ঠিকানা ।
তাদের শাসন খাঁটি সোনা ।
তাদের ধৈর্য্য আর জ্ঞানের মন্ত্র ।
ভরিয়ে রাখে হৃদয় তন্ত্র ।
তারাই আমাদের পথিকৃৎ ।
তাদের শিক্ষা-বচন-বাণী ।
করে মোদের চমৎকৃত ।
তাদের শিক্ষা মোদের দেখায় দিশা ।
তাদের জানাই মোর অশেষ শ্রদ্ধা ।

আমাদের নীরবতার দহন

শেখ ইদ মোরারক
প্রথম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

অজয় একদিন গ্রাস করেছিল সুন্দরপুর
কাদায় মিশেছিল ধান, ভেসে গিয়েছিল আঙিনা,
মানুষের আর্তনাদে ছিঁড়ে দিয়েছিল আকাশ।
আমরা দেখেছিলাম
তবু পারিনি করিতে কিছু
জল গিলে নিয়েছিল ঘর, মাঠ, স্বপ্ন,
মায়ের কোল থেকে হারিয়ে গিয়েছিল সন্তান,
কৃষকের হাতে ফসলাহীন মাটি।

আমাদের বুক ভেঙে গিয়েছিল,
তবুও বাড়াতে পারিনি হাত।
এই অপরাধ বোধই আজও তাড়িয়ে বেড়ায়
আমরা মানুষ হয়েও দাঁড়িয়ে ছিলাম নীরবে,
আমাদের হৃদয়ও ভেসে গিয়েছিল জলে।
তবুও সুন্দুরপুর হারায়নি-
মানুষের হাত আবার তুলেছে ঘর
মাটির বুকে উঠেছে সবুজ ধানের ঢেউ,
শিশুর হাসিতে ভরেছে উঠোন।

অজয় নদীর তাণ্ডব থেমে গেছে,
কিন্তু আমাদের বুকের ক্ষত অমলিন
সেই স্মৃতি মনে করায়
মানুষ যদি অসহায় মানুষের পাশে না দাঁড়ায়,
মানবতার মুখ ঢেকে যায়
নীরবতার লজ্জায়।

সময়ের স্রোত

প্রিয়া মন্ডল, চতুর্থ সেমিস্টার
বাংলা বিভাগ

নীরব নদীর ধারে বসে শুনি
সময়ের পদচিহ্ন ফেলে যাওয়া সুর
পাতার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে
অগণিত অশ্রুজল আর দুর্ভাবনার অমানিশা
একটা সময় ছিল, মাঠের ঘাসে
পায়ে পায়ে স্বপ্নেরা দিত দোলা,
মায়ের কোলে সন্ধ্যার তারা
চুপিচুপি বুনত রূপকথার গল্প।
তখন জীবন মানে ছিল
বন্ধুর চিঠি, ছোট্ট ছুটি,
আকাশে ডানা মেলার ইচ্ছে ,
কিন্তু এখন শহরের কোলাহল,
শব্দেরা পাথর হয়, মন হয় গুহা,
হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত পায়ে
জীবন শুধু সময়ের দাস, নিঃশব্দ দুঃখ সুখ।

ট্রেনের জানালায় ভেসে যায়
বহে চলা মুখ, নিঃসঙ্গ হাসি,
কেউ বা হারিয়ে গেছে প্রেমে,
কেউ বা নিজেকেই ভালোবেসে
তবুও আমরা চলি সকাল-সন্ধ্যা,
একদিন বুঝি, সময়টাই আসল নদী।
স্মৃতির ঢেউয়ে যখন ডুবে যাই
তখনই দেখি প্রেম, ব্যথা সবই ছিলে তুমি।

আমার সুখ-দুঃখ

সোনালি পাল
তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

যখন ছিল ছোটোবেলা পেয়েছি অনেক সুখ
এখন তবে বড়ো হয়েছি পাচ্ছি কী দুখ ?
ভাবতে বসি আকাশকুসুম খুঁজে নাহি পাই
আমার মতো এত দুঃখী কেউ আছে কী নাই ?
কখনই বা সুখ পেয়েছি কখনই বা দুখ
ভাবতে বসলে দেখা যায় সবই যেন দুখ।
শুরু করি ছোটোবেলা, তোমরা তবে শোনো
আমার মতো মাকে ভয় কে কে পেতে বলো।
পড়তে বসার সময় জানো ছিল মায়ের ভয়
জোর করে খাওয়াতো খাবার আমার ইচ্ছেয় নয়।
স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিন পড়ে যে খুব মনে
কত যে কান্না করেছি আমি উঠে মায়ের কোলে।
এগুলো কী সত্যিই দুঃখ ? সুখ তবে কী ?
এখন আমি সুখের মানে খুঁজেতে বসেছি ।
এখন মা বলে আমায়-আমি কী যে বলি বল
তুই তো মা বড়ো হয়েছিস, ভালোটা বুঝে চল ।
তবে এখন কীসের দুঃখ এটাই ভেবে মরি
মা তো আর জোর করেনা ইচ্ছে মতো চলি ।
ফেলে আসা দিনগুলো কী ছিল তবে সুখ ?
এখন যেটা হচ্ছে আমার, এটাই তবে দুখ ?

Home

Chowdhury Razin Sabib
Semester-IV, English Department

Her wedding palanquin was raised in the air
My funeral bier was lifted with care.
Flowers adorned her, some fell on me
Joy on that side, grief here to see.

She walked in red wedding robe's glow
I sank in the dark where funeral shadows grow
Her vows resounded with promises yet unspoken
My grave was dug with a heart already broken.

She walked always, adorned in delight
I lay prepared in the shroud of the night.
She rose and departed, embraced as a bride
I was carried home to the Earth to confide.

The difference was only a moment so small –
She was welcomed in love, I lay buried in all.

Human Fate

Souvik Ghosh
Semester-III, English Department

We walk a road both side and thin ,
Not knowing what may lie within.
Some days are bright, some full of rain,
Some bring us joy, some bring us pain.

He dreams; we try, we fall, we rise,
He chases the stars in distant skies,
But Fate, it moves in ways unkown,
A path that's often not our own.

A leaf may float, a stone may sink,
Life changes faster than we think.

We plan today, but who can say
What waits for us another day?

Still hearts stay strong, and hopes stay true,
For fate may bend, but so can you.
So walk with courage, not with fear-
Your path is yours while you are here.

The Quiet Mountains

Keya Pan
Semester-III, English Department

The mountains stand so high and tall,
With snowy and trees so small.
They touch the clouds, they kiss the sky,
And watch the birds go flying by.

So cool and calm, so big and wide,
With hidden paths and streams inside,
The air is fresh, the wind is free,
The mountains feel like home to me.

They never speak, yet tell so much,
With rocks and trees and nature's touch.
A peaceful place where I can stay-
And dream the noisy world away.

Season of Love

Soumodeep Ghosal,
Semester-III, Department of English

The season of love is coming
To manifest real love in all the places,
To dispel sorrow from everywhere
That will lead to a place where there is no place of suffering
Yes, the season of love is coming to give new leaves to those lonely trees
Who lost their leaves due to the dominating winter.
And they may also become colourful by the touch of affection
Who have lost their colour of life
And all people may fill their blank places of mind with love at the eve of spring
As love is the only state that can transcend all earthly despondencies.

Every Morning

Asrina Khatun,
Semester-I, Department of English

In the morning when I am alone,
I like to watch the sun come up.
I play motivational songs on my phone,
I drink fresh coffee from my cute cup.
The sun is shining, fresh and bright,
The sky outside is clear and blue,
The beautiful nature makes my mind light,
As I surround myself with its pleasant hue,
And I say to myself
It will be a good day.

নতুন শিক্ষানীতি

অধ্যাপক সুভাষ সিংহ রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষা মানুষের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে, চিন্তন, আত্মসমীক্ষা ও নৈতিকতার প্রসার ঘটায়; ব্যক্তিকে মার্জিত করে গড়ে তোলে। তাই শিক্ষা হল আতস দীপ্তি করণের (Self-Enlightenment) মাধ্যম। আবার শিক্ষা আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে দেশ তথা জাতি গঠনে সাহায্য করে ।

ভারতে সংগঠিত শিক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রাচীন ভারতের গুরুকূল প্রথা সারা বিশ্বে সুবিদিত ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, মগদালার মত বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত একথা সর্বজন বিদিত। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নির্মিত উপযুক্ত পাঠ্যক্রম সেই সময় ছাত্রমণ্ডলীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়ক ছিল। দশম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রাচীন বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামিক শিক্ষার জনপ্রিয়তা ও প্রসার লক্ষ করা যায়। আরবি ও ফার্সী ভাষার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হত। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ সরকার পরবর্তী কালে ভারতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য, প্রযুক্তি বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যার প্রবর্তন করে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষাকে জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত তদানীন্তন সরকার গ্রহণ করে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮) উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, আবার ১৯৫২ সালে গঠিত মুদালিয়ার কমিশন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক মূল্যবোধ, পেশাগত- উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং সমাজ পরিবর্তনের কাণ্ডারী হিসাবে পরবর্তী প্রজন্মকে প্রস্তুত করার কথা ঘোষণা করে। নেহেরুর মন্ত্রিসভা ১৯৫৮ সালে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে যার ফলশ্রুতি হিসাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি শিক্ষার উচ্চমানের প্রতিষ্ঠান১৯৬০-এর শুরুর দিকে জন্মলাভ করে। ১৯৬৪ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন জাতি গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহনের সুপারিশ করে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে (১৯৬৮) তাই শিক্ষা প্রদানে সাম্যনীতি, আঞ্চলিক ভাষার শিক্ষার সাথে অন্যান্য ভাষার উপর গুরুত্ব প্রদান, ১০+২+৩ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালে গৃহীত শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার, বর্তমান ও ভবিষ্যত সমাজ ও অর্থনীতির উন্নতির কাণ্ডারী হিসাবে গড়ে তোলার উপর

জোর দেওয়া হয়।। ২০০৯ সালে Right of Children to Free and Compulsory Education Act প্রণয়নের মাধ্যমে ৬ বছর থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্র বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করবে বলে অঙ্গীকার করে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদন করেছে। মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন প্রধান ড. কস্তুরীবঙ্গনের সুপারিশ ক্রমে এই নীতি প্রণীত হয়। এই শিক্ষানীতি চারটি অংশে বিভক্ত বিদ্যালয় স্তর, উচ্চ শিক্ষার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন স্তর যেমন বয়স্ক শিক্ষা, অনলাইন শিক্ষা প্রসার, ভারতীয় ভাষা শিক্ষা এবং কার্যকর করার ব্যবস্থা সমূহ। এই নতুন শিক্ষানীতি বিগত তিন দশকের অধিক প্রচলিত শিক্ষা নীতির অবসান ঘটিয়ে নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করে। ২০৩০ সালের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতকে জ্ঞান বিজ্ঞানের পীঠস্থান হিসাবে নির্মাণ করা এবং একবিংশ শতাব্দীর চাহিদার কথা মাথায় রেখে শিক্ষার্থীর বিকাশ ঘটানো।

স্নাতক স্তরে নতুন শিক্ষানীতি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছে। কলা, মানববিদ্যা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি গঠিত শিক্ষার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর কথা ঘোষণা করা হয়। কলা, বানিজ্য ও বিজ্ঞান শাখার মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ধারনার অবসান ঘটানো হয়। স্নাতক স্তর তিন বছর ও চার বছরের কার্যকাল হিসাবে রাখা হয় যদিও সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা প্রদানের কথা ১ বছর বা ২ বছরের পর দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয় । বর্তমান শিক্ষানীতি পছন্দ মাফিক, ক্রেডিট ব্যবস্থা যা বহু শাস্ত্রীয় ভিত্তিক, একাধিক প্রবেশ ও বাহিরের সুযোগের সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষানীতি Choice based Credit System, multi- disciplinary and multiple entry and exit options- হিসাবে নিজের উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও মেধা অনুযায়ী পছন্দমত বিষয় নির্বাচনের নমনীয়তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বহু শাস্ত্রীয় বিষয়ের যেমন বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কলা, মানববিদ্যা ও খেলাধূলা মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক ও সমালোচনামূলক চিন্তা, নৈতিক, মানবিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর। জীবন চর্চার দক্ষতা, ভাবের আদান প্রদান, নেতৃত্বের বিকাশ, টিম ওয়ার্কস এবং সহনশীলতা বা অটল মানসিক শক্তি বৃদ্ধির উপরেও জোর দেওয়া হয়। মানসিক, শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার কথা বলা হয়। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঐতিহ্য, ভাষার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রয়োজন।

পাশাপাশি সমাজ সেবা, পরিবেশের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি এবং মূল্যবোধ জনিত শিক্ষার বিস্তারে আগ্রহী। পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণের মনোভাব ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে যাতে দৃঢ় হয় সেইসব বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নৈতিক, সাংবিধানিক সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ, সততা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, প্রেম-প্রীতি, শান্তি,

অহিংসা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রসার ঘটানোর প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। এই সমস্ত গুনাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারলে নাগরিক ও বিশ্বভাতৃত্বের মূল্যবোধে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গঠন করা যেমন সম্ভব তেমনি সমাজ সেবায় অনুপ্রাণিত করাও সম্ভব হবে। স্থানীয় শিল্প, কল কারখানা এবং ওয়ার্কশপে হাতে কলমে কাজ শেখার মাধ্যমে জীবনমুখী শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে জীবন-জীবিকায় সাফল্য লাভের প্রভূত সম্ভাবনা থাকবে। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), মেশিনলার্নিং, বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটকলজি, নিউরোবিজ্ঞানের সাথে পরিবেশ এবং স্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable Development) ধারণা সংযুক্তি করণের মধ্য দিয়ে স্নাতকস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মপযোগী করে গড়ে তোলাও এর লক্ষ্য। জাতীয় নয়া উচ্চ শিক্ষানীতির বৈশিষ্টগুলো এক নজরে দেখা যাক।

১। নমনীয়তা : একশাস্ত্র থেকে অন্য শাস্ত্র পড়ার অবাধ সুযোগ।
২। পছন্দমাফিকতা : নিজের পছন্দমত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা।
৩। বহুবার প্রবেশ বাহিরের সুযোগ : শিক্ষার্থী ১ বছর, ২ বছর, ৩ বছর বছরের মধ্যে কোর্স ছেড়ে আবার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে। তাই এই নীতিকে Multiple Entry Multiple Exit বলে আখ্যায়িত করা হয়।
৪। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ : স্নাতক স্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শেখার সুযোগ পাবে, তাই তার বহুমুখী শিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা থাকবে।
৫। বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ: নয়া শিক্ষানীতি অনলাইন, দূরশিক্ষা, মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, ODL. SWAYAM প্রভৃতি প্ল্যাটফর্ম থেকে ডিগ্রী অর্জনকেও মর্যাদা ও স্বীকৃত প্রদানের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বহু বিকল্পের সম্ভার হাজির করেছে।।

এবারে এক নজরে নয়া শিক্ষানীতির স্নাতকস্তরের গঠন কাঠামো:-

১। সার্টিফিকেট কোর্স (Certificate course) :- কোন ছাত্র বা ছাত্রী যদি কোন কারণে এক বছর পড়ার পর পড়াশুনা স্থগিত বা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তাহলে তাকে এক বছর পড়ার জন্য একটি শংসাপত্র দেওয়া হবে যদি সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রী ৪০ ক্রেডিট অর্জন করে এবং ৪ ক্রেডিটের গ্রীষ্মকালীন বৃত্তিমূলক কোর্স করে থাকে। সেই ছাত্র বা ছাত্রী পুনরায় মনে করলে পড়াশুনা শুরু করতে পারে পরবর্তীকলে।
২। ডিপ্লোমা কোর্স : একই রকমভাবে কোন ছাত্র বা ছাত্রী ২ বছর পর পড়াশুনা ছাড়তে বাধ্য হলে তাকে ডিপ্লোমা শংসাপত্র দেওয়া যাবে, যিনি ৮০ (আশি) ক্রেডিট অর্জন করে এবং গ্রীষ্মাকালীন বৃত্তিমূলক কোর্স (Vocation Course) করে থাকে। পুনরায় সংশ্লিষ্ট ছাত্র - ছাত্রী পড়াশুনা করতে পারবে যদি তার পরিবেশ অনুকূল হয়।

৩। স্নাতক কোর্স:- এই ধরনের কোর্সের মেয়াদ তিন বছর ও চার বছরের হবে । তিন বছরের কোর্সের জন্য প্রয়োজন ১২০ ক্রেডিট এবং একটি গ্রীষ্মকালীন বৃত্তিমূলক কোর্স। একই রকমভাবে চার বছরের স্নাতক কোর্সের জন্য ১৬০ ক্রেডিট ও একটি গ্রীষ্মকালীন বৃত্তিমূলক কোর্স।

নতুন শিক্ষানীতি ফলাফল ভিত্তি পদ্ধতির (Outcome based approach) অনুসরণের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। সাধারনত এটা ভাবা হয় একজনের স্নাতকে নিজের বিষয়ের উপর দখল থাকবে । পাশাপাশি তার মধ্যে বিশ্লেষণী শক্তি বৃদ্ধি, যথাযথ ভাব প্রকাশ, জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ, সৃজনশীলতা, গবেষণাধর্মী কৌশল অর্জন, নেতৃত্ব প্রদান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটবে বলে আশা প্রকাশ হয়। পূর্বের শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক (Class room) পড়াশুনার পাশাপাশি বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন [Internship] , সমষ্টি উন্নয়ন বা সেবা, সমীক্ষা, সেমিনার ইত্যাদি সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বাস্তবে তার ব্যবহার ও প্রয়োগ তথা জীবন জীবিকার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা আবশ্যিক। সময়ের সাথে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করার জন্য এই পাঠক্রম নির্মিত। তাই দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের কোর্সের অবতারণা। প্রধান (Major),গৌণ (Minor), আন্ত : শাস্ত্রীর (Inter-disciplinary), মূল্যবোধ জনিত (value added) মাতৃ ও অন্য ভাষা, পরিবেশ বিদ্যা, জীবনশৈলী ইত্যাদি কোর্স একজন শিক্ষার্থীকে শেখানো হবে এবং তার মূল্যায়ন পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন।।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নতুন পন্থা পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ফলাফল ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে শিক্ষককে আধুনিক দান পদ্ধতি যেমন- অংশগ্রহণ মূলক, ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে ক্ষেত্র সমীক্ষা ও এলাকা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, জনসেবার সাথে যুক্ত করা, চাকরি পূর্ব প্রশিক্ষণ (Internship) ইত্যাদির মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতির কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা - সমালোচকগণ নয়া শিক্ষানীতির কতকগুলি সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন। অনলাইন ও ডিজিটাল শিক্ষাপদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে অথচ শিক্ষার্থীর সেইসব সুযোগ সুবিধার অভাব এক্ষেত্রে বিভাজনের সৃষ্টি করবে। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাছাড়া নয়া শিক্ষানীতির সফল প্রয়োগের জন্য পরিকাঠমোর অভাব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চোখে পড়ার মত।

উক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নয়া শিক্ষানীতি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক (Learner Centric) পদ্ধতি, তাদের ভবিষ্যত প্রস্তুতিকরন, অন্তর্ভূক্তি মূলক (Inter-disciplinary) মূল্যবোধ, ভিত্তিক, ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসার, বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

সাসারামের গৌরব : শের শাহ সূরির সমাধি

অধ্যাপক তাপস কুমার মন্ডল
বাণিজ্য বিভাগ

জনশ্রুতি ও সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে জানলাম, ১৪৪ বছরের মহাযোগ- মহাকুম্ভ। কোথায় সেই মহাকুম্ভ ? সেটা নাকি উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ অর্থাৎ বর্তমানে প্রয়াগরাজে। কাজে কাজেই আমরা বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে সপরিবারে মহাকুম্ভ স্নানের পূণ্য অর্জনের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে বের হবো মনস্থির করলাম। আমরা বের হবার আগে থেকেই শুনছিলাম, ওখানে নাকি প্রচন্ড ভিড় হচ্ছে, এমনকি মানুষ পদদলিত হচ্ছে এবং রাস্তাও নাকি ভীষন জ্যাম, তবুও এত বড় মহাযজ্ঞ, প্রতিবন্ধকতা তো থাকবেই, কাজেই বেরিয়ে পরো, কথা যা কাজ তাই। একটি লাক্সারী টুরিস্ট বাস বুক করা হল। এখান থেকে প্রায় ৭০০ কিমি রাস্তা, সময় তো লাগবেই, তার উপর আবার রাস্তা জ্যাম, তাই সকাল সকাল বেরিয়ে পরলাম। ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমরা বর্তমানে NH-19 অর্থাৎ পূর্বতন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে (জি.টি রোড) উঠলাম। রাস্তা ভালো তাই বাস খুব দ্রুতই যাচ্ছিল। বাসচালক ভাই বললো এক সপ্তাহ আগেই আমি মহাকুম্ভ থেকে ফিরলাম, এই NH-19 ধরেই আমাদের যেতে হবে। আমরা বন্ধুরা বলাবলি করছিলাম, যতোই NH-19 বলোনা কেন, এটা আসলে জি.টি রোড, আর এটা শেরশাহ নির্মিত। চালকভাই আমাদের কথার উত্তর না দিয়ে অল্প স্বল্প জ্যাম ভেদ করতে করতে বিকালের দিকে ঝাড়খন্ডের হাজারীবাগে এসে উপস্থিত হলেন। ওখানে অল্প কিছু চা, টিফিন খেয়ে গাড়ি আবার চলতে শুরু হল। সন্ধ্যার পর শুরু হলো আসল রাস্তা জ্যামের খেলা। ১০ মিনিট চলে তো ৩০ মিনিট দাঁড়ায়। এই ভাবেই রাত্রি একটার দিকে আমরা বিহারের সাসারামে এসে দেখলাম, রাস্তা একেবারে ব্লক। শয়ে শয়ে গাড়ি লাইন বন্দী আটকে আছে। চালক ভাই বললো দাদা এই জ্যাম সহজে ছাড়বে না, আপনারা চুপচাপ ঘুমানোর চেষ্টা করুন,আর আমি যেমন ফাঁকা রাস্তা পাবো সেইমতো যাব। আরো বললো আপনারা আগে জি.টি রোড ও শের শাহ সূরির কথা বলছিলেন না? আপনারা কি জানেন যে, এই সাসারামই ছিল তাঁর রাজধানী এবং এখানে তাঁর একটা বিখ্যাত সমাধি অর্থাৎ স্মৃতি সৌধ- আছে। কথাটা শুনে আমাদের উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে গেল, যদি সুযোগ থাকে তবে ফেরার পথে একবার দর্শন করা যেতে পারে। যাইহোক শেষ পর্যন্ত আমরা দুপুর ১২ টার দিকে মহাকুম্ভে পৌছেঁছিলাম। তার পর ওখানে পূণ্যস্নান ও মেলা দেখে রাত্রী ১২ টার সময় বাস ছাড়লাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। ফেরার সময় অবশ্য বিশেষ রাস্তা জ্যাম ছিল না। ফলে সকাল ১০ টার দিকে সাসারামে পৌছেঁ গেলাম আমরা। গাড়ি হল্ট হলো, কারণ রান্না খাওয়ার ব্যাপার ছিল। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের মতো সময় লাগবে, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমরা পাড়ি দিলাম শের শাহ সূরির মকবরা বা সমাধিক্ষেত্র। ব্যাস্ত বহুল সাসারাম শহরের মধ্যে এত নির্জন

ও শান্তিপূর্ণ স্থান আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করলো। একটি বড় চারকোনা জলাশয়ের ঠিক মাঝখানে উচুঁ ভিত্তি প্রস্তরের উপর দন্ডায়মান সম্রাট শের শাহর সমাধিক্ষেত্র। একটি রাস্তার একপাশে এই জলাশয় ও সমাধিক্ষেত্র অন্যদিকে বেশ প্রশস্ত একটা চত্বর। আমরা সৌধে প্রবেশ করার টিকিট সংগ্রহ করলাম। মহাকুম্ভ ফেরত বেশ ভালোই টুরিস্টের ভিড় রয়েছে। বুঝলাম আমাদের মতো অনেকেই আগ্রহ নিয়ে এসেছে। প্রবেশ পথের সামনেই পিতলের ফলক। এখানে শের শাহের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সমাধিক্ষেত্রের পরিচয় লেখা রয়েছে। এই আফগান বংশোদ্ভুত মানুষটি মুঘল শাসকের অধীনস্ত একজন সেনাপতি হিসাবে সুলাতনিয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে বিহারের শাসনকর্তা হন। ১৫৪০ সালে তিনি দিল্লির মসনদ দখল করেন।

খুব অল্প সময় তিনি দিল্লির শাসনকর্তা থাকলেও ওই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শাসন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি 'রুপিয়া' নামক মুদ্রার প্রচলন করেন। ১৫৪৫ সালে তিনি চান্দেলের রাজধানী কালিঞ্জর দখল করতে গেলে বারুদ বিস্ফোরণে মৃত্যু রবণ করেন। এরপর তার সেনাপতিরা কালিঞ্জর দখল করে শের শাহের মৃত দেহ সাসারামে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তার পূর্ব নির্দেশ মতো এখানেই সমাধিস্ত করেন। এই জি.টি রোড পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম রাস্তা। মায়ানমার থেকে শুরু করে অধুনা পাকিস্তান, কাবুল ও কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথেই সম্রাট অশোক রথচক্র করেছিলেন। তাঁরও আগে গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে পরিক্রমা করেছেন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে শের শাহকে এই রাস্তার নির্মাতা বলা যায় না, তিনি এই পথটির সংস্কারক। তিনিই এই সড়কের আধুনিকীকরনের কাজ করেছিলেন।

এবার আমি আসছি সমাধিক্ষেত্র সম্পর্কে, কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করে একটি পাথুরে কক্ষের ভিতর দিয়ে একটি সেতুতে উঠলাম। এই পাথুরে কক্ষের ভিতরেও অনেক কবর রয়েছে। কক্ষ অতিক্রম করে সেতু বেয়ে মূল সমাধিক্ষেত্রের দিকে এগোলাম। প্রবেশ করলাম অষ্টভুজাকৃতি মাথায় গম্বুজওয়ালা স্মৃতি সৌধে। ইন্দো-ইসলামিক বা আফগানি স্থাপত্যের একটি আশ্চর্য নিদর্শন। মূল সমাধিক্ষেত্রের বাইরেটা অলিন্দ দিয়ে ঘেরা। ইসলামিক স্থাপত্যনীতি অনুসারে সার সার খিলান। এই চত্বরটা লাল-বেলে পাথরের নির্মান কার্য। চার কোণে চারটি চৈত্য আছে। কারুকার্যগুলি স্থানে স্থানে ভঙ্গুর। অলিন্দ থেকে একটি ঘোরানো সিড়ি গম্বুজের মাথায় উঠে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছালাম সমাধিক্ষেত্রের ঠিক সামনে। যার ঠিক মাথাতেই বিশালাকৃতির গম্বুজ। অনেক কবরের মধ্যে সবুজ চাদরে ঢাকা কবরটিই শের শাহের। কবর দেখে একটা নিতান্ত সাদামাটা মনে হলেও এই কবরের নিচেই শায়িত রয়েছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক মহানায়ক সম্রাট শের শাহ সূরি। শের শাহ আজও অমর হয়ে আছেন তার জনহিতকর কাজের মধ্যে দিয়েই। তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা প্রস্থান করলাম এক অনাবিল শান্তির ও নির্জন মায়াময় স্থান থেকে। নতমস্তকে নমস্কার তোমাকে, তোমার জন্যই আজ এই জি.টি রোড। বিদায় সাসারাম।

বাল্যবিবাহ : একটি সামাজিক অভিশাপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মায়েশা আফরোজ
দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

বাল্যবিবাহ অর্থাৎ আইনগতভাবে নির্ধারিত বয়সের পূর্বে বিবাহ একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি যা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি শিশুর জীবনকে প্রভাবিত করে। এটি কেবল তাদের শৈশব কেড়ে নেয় না, বরং শিক্ষা, মানসিক বিকাশ এবং ভবিষ্যতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। এই প্রবন্ধটিতে বাল্যবিবাহের সমস্যা, কারন, ভয়াবহতা, পরিণতি - এই প্রথা নির্মুলের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, বর্তমান এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দারিদ্র, কুসংস্কার, লিঙ্গবৈষম্য, শিক্ষার অভাব এবং নিরাপত্তার অভাবকে এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বাল্যবিবাহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের কারণ ও ফলাফলের পরিবর্তন নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। সবশেষে এই প্রথা নিবারণের জন্য আইনি, সামাজিক ও শিক্ষাগত পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

বাল্যবিবাহ, বিভিন্ন দেশের বাল্যবিবাহের ইতিহাস, বাল্যবিবাহের কারণ সমূহ, পরিণতি সমূহ, ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপায় এগুলি হলো এই প্রবন্ধের সূচক শব্দ।

বাল্যবিবাহ মানব সমাজের এক দীর্ঘস্থায়ী এবং গভীর সমস্যা। যদিও এটি আধুনিক বিশ্বে একটি মানবাধিকারী লঙ্ঘন এবং আইনগত দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত এবং আজ মানব ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। এটি শুধুমাত্র বর্তমান শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে না, বরং অতীতের অনেক সামাজিক রীতি নীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিচ্ছবিও বটে। এই প্রবন্ধটি বাল্যবিবাহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান সময়ের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা- এই দুটিকে একত্রিত করে একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন দেশের বাল্যবিবাহের বর্তমান পরিস্থিতি, কারণ, ফলাফল, প্রতিরোধের উপায়, আইনি ব্যবস্থা এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা এবং প্রতিকারের উপর।

এই প্রবন্ধটি মূলত গুণগত বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার প্রতিবেদন, যেমন- United Nations International childern's Emergency Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO), National Crime Records Bureav (NCRB), সরকারী আইন এবং নীতিমালা ও

সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য প্রাচীন নথি, ধর্ম গ্রন্থ, আইনগত কোড, সাহিত্য রচনা এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সময়ের বাল্যবিবাহের কারণ এর ধরন এবং ফলাফলের সাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের বাল্যবিবাহের ইতিহাস:-

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল, তবে বৈদিক যুগের প্রথম দিকে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। ধর্মীয় গ্রন্থ ''মনুসংহিতা''-তে কন্যাকে ঋতুমতী হওয়ার পূর্বেই পাত্রস্থ করার বিধান পাওয়া যায়। এর কারন ছিল নারীর পবিত্রতা রক্ষা, বংশ রক্ষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস।

প্রাচীন মিশরে খুব কম বয়সে মেয়েদের বিবাহের প্রথা ছিল, তবে বিবাহের গড় বয়স অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় বেশী ছিল। মেয়েরা ১৫-১৬ বছর বয়সে এবং ছেলেরা ১৮/২০ বছর বয়সে বিবাহ করত। তবে রাজ পরিবারের রাজনৈতিক মিত্রতার জন্য অল্প বয়সে বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল। যেমন আখেনাতেনের কন্যা অ্যানখেসেনামুল তার সৎ ভাই তুতানখামুনের বয়স ছিল ৮-১০ বছর। এই মিলন রাজকীয় একবংশীয় বিবাহের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

রোমান আইনে বিবাহের জন্য সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়েছিল মেয়েদের জন্য ১৩ ও ছেলেদের জন্য ১৪ বছরের উপর, তবে বাস্তবে মেয়েরা প্রায়শই ১৩-১৫ বছর বয়সে বিবাহ করতেন। বিশেষ করে অভিজাত পরিবারের মেয়েরা। পিতার অধিকার ও কর্তব্য ছিল তাদের সন্তানদের জন্য একটি ভালো এবং কার্যকার সঙ্গী খোঁজা। প্রাচীনকালের শেষের দিকে, বেশীরভাগ রোমান মহিলারা তাদের কিশোর বয়সের শেষের দিকে বা বিশের দশকের গোড়ার দিকে বিয়ে করতেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মহিলারা নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের তুলনায় কম বয়সে বিয়ে করতেন, কারণ কুমারীত্ব ও প্রজনন ক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো।

প্রাচীন গ্রীক সমাজে বাল্যবিবাহ ছিল একটি সাধারণ প্রথা। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের গড় বয়স ছিল ১৪-১৫ বছর। খ্রীষ্টান বিবাহে মেয়েদের বয়স ছিল প্রায় ১৮ এবং পুরুষদের বয়স ছিল প্রায় ২৫। পারিবারিক মিত্রতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বংশরক্ষা ছিল এর প্রধান কারণ।

প্রাচীন চীনে অল্প বয়সে বিবাহ, বিশেষ করে মেয়েদের ছিলে খুবই সাধারণ। এর কারণ ছিল পরিবারের ধারাবাহিকতা পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা।

কারণ সমূহ :-

বাল্যবিবাহের কারণগুলি হলো নিম্নরূপ:-

১। দারিদ্রতা-

দরিদ্র পরিবারগুলি প্রায় সময় আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়। যৌতুক প্রথার কারণে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, কারণ মেয়ের বয়স বাড়লে যৌতুকেরও পরিমাণ বেড়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারগুলো মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ‘নববধূর মূল্য’’ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা পায়, যা তাদের তাৎক্ষনিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করে।

২। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব:-

শিক্ষার অভাবে অভিভাবকেরা বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত থাকেন না। তারা মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন না এবং মনে করেন পড়াশুনার চেয়ে বিয়েই বেশি জরুরী। আবার শিক্ষার অভাবে মেয়েরা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারে না এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত থাকে না। যেখানে শিক্ষার হার কম, সেখানে বাল্যবিবাহের ঘটনা বেশি দেখা যায়।

৩। লিঙ্গবৈষম্য ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ :-

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের বোঝা হিসাবে দেখানো হয়। তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন অধিকার থাকে না এবং পরিবারের পুরুষদের ইচ্ছাই বেশি প্রাধান্য পায়।

৪। ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কার :-

কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যাখ্যার ভুল প্রয়োগ বা স্থানীয় কুসংস্কার বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করে, অনেক সমাজে মনে করা হয় যে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া ‘‘পুণ্যের কাজ’’।

৫। নিরাপত্তাহীনতা:-

সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বিশ্বজুড়ে বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ। মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার অজুহাতে, বিশেষ করে সম্মান রক্ষা বা ধর্ষণের ভয়ে অনেক অভিভাবক অল্প বয়সে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেন।

৬। আইনের দুর্বল প্রয়োগ:-

বাল্যবিবাহ বিরোধী আইন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ হয় না। যার ফলে অপরাধীরা ছাড় পেয়ে যায়;

পরিনতিসমূহ:-

বাল্যবিবাহের পরিণতি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো:-

১। স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি:-

অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও প্রসবের ফলে মৃত্যু ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়। অপরিণত বয়সে শরীর ধারণের জন্য প্রস্তুত না থাকাই মেয়েদের রক্তশূন্যতা এবং অন্যান্য জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা যায়।

২। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া:-

বাল্যবিবাহের ফলে ছেলে বা মেয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় না।

৩। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন :-

অল্প বয়সী বধূগণ বেশিরভাগে ক্ষেত্রেই শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না থাকায় প্রতিবাদ করতে পারে না।

৪। সামাজিক বিকাশ ব্যাহত:-

বাল্যবিবাহ একটি সমাজের সামগ্রিক মানবিক ও অর্থনৈতিক বিকাশকে ব্যাহত করে।

ভারতবর্ষে বাল্যবিবহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা:-

ভারতীয় উপমহাদেশে বাল্যবিবহের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। তবে ঋক্ বৈদিক যুগও পরবর্তী বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহ ভিন্ন প্রকারের ছিল। ঋক্ বৈদিক যুগে (আনুমানিক ১৫০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ) বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। এই যুগের নারীরা সাধারণত পরিণত বয়সে বিবাহ করতেন।

পরবর্তী বৈদিক যুগে (আনুমানিক ১০০০-৬০০ খ্রীঃ পূঃ) বাল্যবিবাহ প্রথা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে সমাজে গ্রহণ যোগ্যতা পায়, এই যুগে নারীর মর্যদা হ্রাস পায় এবং তারা পুরুষের অধীনস্থ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেন। এর কারণ ছিল নারীর পবিত্রতা রক্ষা, বংশ রক্ষা, এবং ধর্মীয় বিশ্বাস এই প্রথা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগে ভারতে বাল্যবিবাহ একটি ব্যাপক সামাজিক প্রথা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে মেয়েদের বিবাহের বয়স আরও কমে আসে, অনেক ক্ষেত্রে ৮-৯ বছর বয়সেই তাদের বিয়ে দেওয়া হত, কারণ কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন, মুসলিম সমাজের আগ্রাসনের সময় নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বাল্যবিবাহের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। আবার ধর্মীয় ও সামাজিক গোড়ামিও বৃদ্ধি পায়।

ঊনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনকালে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে। রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধীর মতো সমাজ সংস্কারকরা বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন শুরু করেন। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ এই আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে । ১৮৬০ সালের ভারতীয় দন্ডবিধি আইনে ১০ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সারদা আইন) বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিল। এতে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৪ বছর এবং ছেলেদের ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়। এটি শুধু হিন্দুদের জন্য নয়, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে (১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হলে), বাল্যবিবাহ আইনের আরও সংশোধন আসে। ২০০৬ সালের বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইনটি বাল্যবিবাহের প্রতিরাধের জন্য আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়ে আসে এবং এটি বর্তমানে ভারতে প্রযোজ্য।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মহান ব্যক্তিদের অবদান:-

ভারতীয় নবজাগরনের পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত রাজা রামমোহন রায় বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ছিলেন। তার প্রধান সংগ্রাম ছিল সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধ করা। তিনি নারীদের সামগ্রিক অবস্থায় উন্নতির জন্য কাজ করেছেন এবং বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন । তিনি ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা

করেন, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজ প্রচলিত কুসংস্কার, যেমন বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের লড়াই করা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরেছেন ১৮৫০ খ্রীঃ 'সর্ব শুভঙ্করী' পত্রিকায় প্রকাশিত তার 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে তিনি বাল্যবিবাহের কারণ, কুপ্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ।

মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন, বাল্যবিবাহ কেবল সমাজের ক্ষতি করে না, এটি নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। তাই তিনি তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে বাল্যবিবাহের তীব্র নিন্দা করতেন। গান্ধীজী গ্রামীণ ভারতে সাধারন মানুষের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাল্যবিবাহের প্রতিরোধের উপায়:-
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপায়গুলি হলো নিম্নরুপ:-

১। আইন প্রয়োগ ও প্রতিরোধ:-
বাল্যবিবাহ বিরোধী বিভিন্ন আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

২। সচেতনতা বৃদ্ধি :-
গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়:-
ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য শিক্ষার মানোন্নয় করা, কারণ শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার থেকে দূর করতে পারে।

৪। সামাজিক আন্দোলন:-
বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন:-

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিভিন্ন আইনগুলি হলো:-

১। বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন ১৯২৯ সারদা আইন:-

এটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইন অনুযায়ী মেয়েদের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ১৪ এবং ছেলেদের বয়স ১৮ বছর নির্ধারিত করা হয়।

২। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরন আইন, ২০০৬:-

এটি ১৯২৯ সালের সারদা আইনের সংশোধিত রূপ। এই আইনটি বাল্যবিবাহকে একটি দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে এবং বিবাহের নূন্যতম বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর নির্ধারন করা হয়।

৩। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮:-

এটি বিবাহকে নারী ও পুরুষ উভয়েই পূর্ণ স্বাধীন সম্মতির ভিত্তিতে সংঘটিত করার অধিকার নিশ্চিত করে।

উপসংহার:-

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে, বাল্যবিবাহ কেবল একটি সামাজিক প্রথা নয়, এটি একটি মানবাধিকার লঙ্ঘন, যা একটি প্রজন্মের উন্নয়ন থামিয়ে দেয়। ভারত সহ সমস্ত দেশকে এই প্রথা রোধ করতে আইনি ও সামাজিক পদক্ষেপ একযোগে নিতে হবে। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক চাপ ও পারিবারিক দারিদ্রাকে কেন্দ্র করে বাল্যবিবাহ চালু থাকে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, পুলিশ প্রশাসনের কঠোর নজর দিতে হবে। মেয়েরা যেন নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন একটি সমাজ গঠনের দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়নে মানব সভ্যতার ভূমিকা

তনুরা খাতুন, চতুর্থ সেমিস্টার
ইতিহাস বিভাগ

''মানব সভ্যতা একদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য দায়ী হবে মানুষ নিজেই''

\- স্টিফেন হকিং

পৃথিবী প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্তন যদি হয় মানুষের আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের ফল, তবে তা সভ্যতার জন্য বিপদের বার্তা বহন করে। আজকের বিশ্ব ঠিক এমনই এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ঝলকানির আড়ালে আর্তনাদ চাপা পড়ে যাচ্ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন, ভোগবাদ-সব মিলিয়ে মানুষের 'অগ্রগতির' পথ যেন প্রকৃতিকে পিষে এগিয়ে চলা এবং নিষ্ঠুর রথ-যাত্রা।

এই অগ্রগতিরই এক কঠিন পরিণাম হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন - যা শুধু পরিবেশগত বিপর্যয় নয়, বরং মানবিক ও নৈতিক সঙ্কটও। হিমবাহ গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চ হচ্ছে, জলবায়ুর আচরণ ক্রমশ উন্মত্ত হয়ে উঠছে এবং মানব অস্তিত্বের মাটি যেন পায়ের নীচ থেকে সরে যাচ্ছে। অথচ এই সমস্ত বিপর্যয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে যে মানুষ নিজেই রয়েছে, সে বিষয়টি আমরা অনেকেই বুঝতে চাইনা, কিংবা বুঝেও অবহেলা করি।

এই সঙ্কট থেকে উত্তরণ সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়- যদি আমরা মানুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করি।

'' প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয় না-সে শুধু প্রতিক্রিয়া দেখায়''

অনামা

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology):-

সম্পর্কিত গবেষণা ও বিশ্লেষণ সাধারণত নীচের পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয় :

তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)

* আবহাওয়া কেন্দ্র, স্যাটেলাইট ও জলবায়ু, গবেষণা সংস্থাগুলোর সাহায্য, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সমুদ্র পৃষ্ঠ, বরফ গলন ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

* NASA, IPCC, NOAA - এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা এই তথ্য প্রদান করে।

গ্যাস বিশ্লেষণ (Green house Gas Analysis):-

* কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস, অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার পরিমাপ করা হয়।

* কোন উৎস থেকে গ্যাসগুলো নির্গত হচ্ছে (যেমন- যানবাহন, কৃষি) তা চিহ্নিত করা হয়।

জলবায়ু মডেলিং (Climate Modeling):-

* ভবিষ্যতে তাপমাত্রা ও আবহাওয়া কেমন হতে পারে, তা পূর্বাভাস দিতে কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করা হয়।

* IPCC- এর রিপোর্টে এসব মডেলিং বিশ্লেষণ দেওয়া থাকে।

ক্ষতিকর প্রভাব নির্ধারণ (Impact Assessment):-

* কৃষি, জলস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব নিরূপণ করা হয়।

* সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা ও ঝড়ের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়।

সমাধানমূলক পদ্ধতি (Miligation and Adaptation Methods):-

* নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, বনায়ন, জ্বালানী দক্ষতা বৃদ্ধির মতো পন্থা গ্রহণ।

* জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কৌশল (Adaptation) :- যেমন বন্যা প্রতিরোধ, বাঁধ, খরা, সহনশীল চাষাবাদ।

এই পদ্ধতিগুলো আমাদেরকে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব বোঝাতে সহায়তা করে এবং সেই অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তব সম্মত সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

মূল আলোচনা:-

বিশ্ব উষ্ণায়ন বলতে বোঝায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা অনবরত বৃদ্ধির প্রক্রিয়া, যা মূলত অতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণে ঘটে। প্রাকৃতিকভাবে কিছু তাপ বায়ুমণ্ডলে থেকে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখে- এই প্রক্রিয়াকে বলে গ্রিনহাউস প্রভাব। কিন্তু যখন এই গ্যাসগুলোর মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন তা পৃথিবীর তাপমাত্রাকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে তোলে, এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিই হল বিশ্ব উষ্ণায়ন, যা বর্তমানে মানব সভ্যতার জন্য এক চরম হুমকি ।

বিশ্ব উন্নয়নের ইতিহাস ঘাঁটিলে দেখা যায়, এর সূচনা হয়েছিল ১৮শ শতকের শেষ দিকে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে। তখন ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কয়লা পোড়ানো শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে, ১৯৫০-এর দশকে ব্যাপক হারে শিল্পায়ন শুরু হলে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরন বাড়তে থাকে। বিজ্ঞানী স্যুভান্তে আরেনিয়াস সর্বপ্রথম অনুমান করেছিলে যে, অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড জলবায়ু পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এরপর গঠিত হয় lPCC (Intergovernmental Panel on climate change) যা এখন বৈশ্বক উষ্ণতা ও তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

১৯৮৮ সালের নাসা বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসেন মার্কিন সিনেটে বলেন যে পৃথিবী এখন স্পষ্টভাবে উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সেই বক্তব্য ছিল এক যুগান্তকারী মুর্হূত। ২০০৩ সালে ইউরোপে গ্রীষ্মকালীন দাবদাহে ৭০,০০০-এর বেশী মানুষের মৃত্যু বিশ্বকে হতবাক করে তোলে। ২০১০ সালে রাশিয়ায় ভয়াবহ দাবানলে প্রায় ৫৬,০০০ মানুষের মৃত্যু হয় এবং লাখ লাখ হেক্টর বনভূমি ছাই হয়ে যায়। এগুলো ছিল বিশ্ব উন্নয়নের প্রভাবের বাস্তবও ভয়াবহ উদাহরণ।

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি আরো আতঙ্কজনক, ২০২৩-২৪ সালে বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রার রেকর্ড ভাঙ্গা গরম দেখা যায়। ভারতের দিল্লি ও রাজস্থানে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে যায়, যা মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। বাংলাদেশেও ২০২৪ সালের মার্চ-এপ্রিল অভূতপূর্ব তাপপ্রবাহ দেখা দেয়, যার ফলে দুই দফা স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখতে হয়। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চলে আকস্মিক জলাবদ্ধতা, পঞ্চগড়ে খরা ও পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রত্যক্ষ ফল।

এই উষ্ণণয়নের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, বরফা গলছে মেরু অঞ্চলে, ফলে উপকূলীয় এলাকাগুলো প্লাবনের ঝুঁকিতে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ জমি পানির নীচে চলে যেতে পারে, এবং প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্ত হতে পারে। এছাড়া সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাস হুমকির মুখে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের আরেকটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে জীববৈচিত্য ধ্বংস। অস্ট্রেলিয়ায় দাবানল, আমাজনের বনাঞ্চালে আগুন, আফ্রিকায় খরা ও বন্যার কারণে হাজার হাজার প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে। IUCN- এর তথ্যমতে, পৃথিবীর ১ মিলিয়ানের বেশি প্রাণি ও উদ্ভিদের বিলুপ্তির আশঙ্কা রয়েছে।

মানব স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এর প্রভাব মারাত্মক। WHO- এর প্রতিবেদন বলছে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার অতিরিক্ত মৃত্যু হতে পারে- হিটস্ট্রোক, অপুষ্টি, জলবাবাহিত রোগ এবং ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গু বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ ডেঙ্গু সংক্রমণের অতিরিক্ত বৃদ্ধি এর ইঙ্গিত বহন করে।

এই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন বাস্তব ও দ্রুত পদক্ষেপ। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫) অনুযায়ী, বিশ্বকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কিন্তু অনেক দেশ সেই লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ। উন্নত দেশগুলো এখনও ব্যাপক কার্বন নিঃসরন করছে। বিশ্বজুড়ে নবায়ণযোগ্য শক্তির ব্যবহার, যেমন - সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎকে উৎসাহ দিতে হবে। যানবাহনে ইলেকট্রিক প্রযুক্তি ও কলকারখানায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি চালু করা উচিত।

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে ``DELTA Plan 2100`` বাস্তবায়ন করছে, যার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা, নদী ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার রূপরেখা তৈরি হয়েছে। এছাড়া **Banladesh climate change strategy and Action Plan (BCCSAP)** বাস্তবায়ন হচ্ছে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের অংশ হিসেবে।

এখন সময় এসেছে ব্যক্তি পর্যায়েও দায়িত্ব নেওয়ার। পরিবেশবান্ধব অভ্যাস যেমন- পুণর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য ব্যবহার, গাছ লাগানো, বিদ্যুৎ ও পানিয় অপচয় রোধ, প্লস্টিক বর্জন এবং গণপরিবহনের ব্যবহার এইসব ছোটো উদ্যেগ বিশ্বকে বড়ো বিপদ থেকে রক্ষা করতে

পারে। পরিবেশ মানেই জীবন, আর সেই জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার।

বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি নিঃশব্দ বিপর্যয়, যা ধীরে ধীরে আমাদের এই একমাত্র বাসযোগ্য পৃথিবীকে বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছে। মানুষের লোভ, নির্বিচারে নিধন, অদূরদর্শী উন্নয়ন এবং দায়িত্বহীন জীবনযাপন এর মূল কারণ। অথচ প্রকৃতি বারবার আমাদের সতর্ক করছে - বন্যা, খরা, সাইক্লোন, বরফ গলা, কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয়,প্রাকৃতিক সম্পদের বিলুপ্তি সবই তার চিহ্ন।

তবে আমরা এখনো সময়ের মধ্যে আছি। পরিবেশ রক্ষা করতে গেলে আমাদের সচেতন হতে হবে। নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব নিতে হবে। নাবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণ, গাছ লাগানো, জ্বালানি ও প্লাস্টিক অপচয় রোধ- এই ছোটো ছোটো উদ্যোগই হতে পারে বড় পরিবর্তনের সূচনা।

আমরা যদি এখনই সিদ্ধান্ত নিই, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যেতে পারি একটি সুবজ, সুস্থ টেকসই পৃথিবী। মনে রাখতে হবে। ''পৃথিবী আমাদের উত্তরাধিকার নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ধার'' সেই ধার আমরা রক্ষা করব - এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে আমাদের দায়িত্ব

প্রণতি ঘোষ
দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

মানুষ এবং পরিবেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং পরস্পর নিভরশীল। সহজ কথায়, মানুষ পরিবেশেরই একটি অংশ। আমাদের অস্তিত্ব, সভ্যতা এবং উন্নয়ন সবকিছুই পরিবেশের সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের শ্বাস - প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন, পানের জন্য জল এবং বেঁচে থাকার জন্য তাপমাত্রা-এ সবকিছু মূল্যবান সম্পদ আমরা পরিবেশ থেকে পাই। কৃষিকাজের মাধ্যমে ফসল, নদী সমুদ্র থেকে মাছ এবং প্রাণিজ আমিষ সবই পরিবেশের দান এবং এসবই পরিবেশের অংশ। বাসস্থান তৈরির উপকরণ (কাঠ, পাথর), পরিধানের বস্ত্র (তুলা, রেশম) এবং শিল্প ও প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ ও জ্বালানি (কয়লা, তেল, গ্যাস) আমরা পরিবেশ থেকেই আহরণ করি। কৃষি, মৎস্য, পর্যটক, শিল্প, মানুষের অধিকাংশ জীবিকাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশের সাথে যুক্ত।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বলতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বোঝায়, যা মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে ঘটে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করছেন যে, মানব সভ্যতা এই সমস্যার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানবজাতি বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প কারখানা পরিচালনা এবং যান-বাহনের জন্য কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বিপুল পরিমানে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। যা গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় ব্যবহৃত রাসায়নিক সার থেকে নাইট্রাস অক্সাইড এবং পশুপালনের ফলে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়। এই দুটি গ্যাসের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস। নগরায়ন, কৃষিজমির বিস্তার এবং কাঠ সংগ্রহের জন্য নির্বিচারে বনভূমি কেটোফেলা হচ্ছে। বনভূমি পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবে কাজ করে, কারণ গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। বনাঞ্চাল ধ্বংসের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প কারখানা থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয়। এছাড়া শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণেও মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। এর ফলে তীব্র ঝড়, খরা এবং দাবানলের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ এবং হিমবাহ দ্রুত গলে যাচ্ছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করছে। এর ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের দেশগুলো জলমগ্ন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান হারাচ্ছে, যা জীব বৈচিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।

আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, এবং জলবিদ্যুৎ এর মত শক্তির উৎস ব্যবহার করতে হবে। বৃক্ষরোপণ অভিযান জোরদার করতে হবে এবং বিদ্যমান বনভূমি সংরক্ষণে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সামাজিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রচার চালানো প্রয়োজন। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। গণপরিবহন ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও জল সাশ্রয় করা, এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য ব্যবহার করা এর অন্যতম অংশ।

বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এর সমাধান মানব সভ্যতার যৌথ প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের প্রতিটি ছোট পদক্ষেপ, যেমন প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করা, একটি করে গাছ লাগানো এই সমস্যার সমাধানে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এখন সময় এসেছে আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত দায়িত্ব বোঝার এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার । আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিত করতে হলে এখনই সচেতন হতে হবে।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

জয়তী সাঁতরা
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

মহাকুম্ভ স্নান হলো সনাতন ধর্মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহোৎসব, যা প্রতি ১৪৪ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়, এটি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশগুলির মধ্যে অন্যতম, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হন। মহাকুম্ভে বিভিন্ন স্থান থেকে সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত সাধারণ মানুষ অংশ নেন, এই বিশ্বাসে যে পবিত্র নদীতে স্নান করলে পাপ মোচন হয় এবং আত্মশুদ্ধি ঘটে। মহাকুম্ভ সাধারণত প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ)-এ অনুষ্ঠিত হয়, যা গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল, এই মহাকুম্ভ প্রতি ১৪৪ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়, যা ১২টি পূর্ণ কুম্ভ মেলার পর আসে, এর পৌরাণিক কাহিনি সমুদ্রমন্থন বা অমৃতমন্থন, যেখানে দেবতা ও অসুররা অমৃত লাভের জন্য মহাসমুদ্র মন্থন করেন। এই মন্থনের ফলে যে অমৃত লাভ হয় তার চারটি ফোঁটা পবিত্র স্থানে পড়েছিল - প্রয়োগরাজ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়িনী । মহাকুম্ভের পবিত্র জলে স্নানের মূল কারণ হলো আধ্যাত্মিক শুদ্ধি ও মোক্ষ লাভ করা, যা কিছু বিশ্বাস অনুযায়ী পাপ থেকে মুক্তি ও পুনর্জন্মের চক্রের অবসান ঘটায়। এটি পৌরানিক কাহিনির সাথে যুক্ত। যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে অমৃতের ফোঁটা কিছু পবিত্র স্থানে পড়েছিল এবং সেই স্থানগুলির নদীতে স্নান করলে পাপ থেকে মুক্তি ঘটে। এ বছরের মহাকুম্ভ ১২ই জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে শুরু হয়, এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে শেষ হয়। মহাকুম্ভ যেহেতু ১৪৪ বছর পর একবারই অনুষ্ঠিত হয়। তাই আমার খুব ইচ্ছা করছিল এই বিশেষ তীর্থ যাত্রায় যদি অংশ গ্রহণ করতে পারি তাহলে মন্দ হয় না। তাই বেশি দেরি না করে আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে ২৪শে ফেব্রুয়ারী বেরিয়ে পড়লাম মহাকুম্ভের উদ্দেশ্যে। আমরা ২৬শে ফেব্রুয়ারী সকালে প্রয়াগরাজ পৌঁছে যায় এবং সেখানে আমরা গাড়ি ভাড়া করে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সঙ্গমের কাছকাছি এসে দেখি একটা আলাদা নগরীতে সেজে উঠেছে প্রয়াগরাজ । সত্যি বলতে নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বেশী দেরি না করে আমরা পবিত্র নদীতে স্নান করি। সত্যি কথা বলতে একটা আলাদা অনুভূতি যা আমি বলে বোঝাতে পারব না। মানুষ যে বিশ্বাস নিয়ে এই পবিত্র নদীতে স্নান করে আধ্যাত্মিক শুদ্ধি ও মোক্ষ লাভ হয় নাকি জানি না তবে ‘‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু.....’’ কথাটি সত্য যা আমি প্রয়োগরাজ না গেলে জানতে পারতাম না ।

আমার চোখে গ্রন্থাগার

নন্দিনী রায়
দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

গ্রন্থাগার হল জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার এক পবিত্র স্থান,যা পাঠককে বইয়ের মাধ্যমে নতুন ভাবনা, জ্ঞান ও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। এটি কেবল পাঠের ঘর নয়, বরং মননের চর্চা ও সৃজনশীলতার কেন্দ্র। শিশুকাল থকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত একজন মানুষ জীবনের নানা পর্যায়ে গ্রন্থাগার থেকে উপকৃত হয়। আধুনিক যুগে প্রযুক্তি গ্রন্থাগারকে ডিজিটাল রূপ দিলেও বইয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং গ্রন্থাগারে সময় কাটানোর আনন্দ আজও অমলিন। সমাজ ও জাতি গঠনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রন্থাগার আমাদের ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভান্ডার, যা পাঠককে জ্ঞানী, মানবিক ও চিন্তাশীল করে তোলে।

গ্রন্থাগার শুধু একটি স্থাপনা নয়, এটি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার এক মহান কেন্দ্র। এটি এমন এক নীরব শিক্ষাগৃহ, যেখানে বইয়ের পাতা উল্টানোর শব্দেই তৈরি হয় বুদ্ধির আলো। ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে এসেছি, বই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এ কথা যেমন সত্য, তেমনি বইয়ের সেই বন্ধুর সমাবেশস্থল হল গ্রন্থাগার। একজন পাঠকের চোখে গ্রন্থাগার মানে শুধুই পড়া নয়, বরং ভাবনার জগতে ভ্রমণ, আত্মোন্নয়নের চাবিকাঠি এবং এক পরিশীলিত জীবনদর্শনের সূচনা। প্রযুক্তির এই আধুনিক যুগেও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব এতটুকু কমেনি, বরং আরও ব্যাপক হয়েছে। আমার চোখে গ্রন্থাগার এক অপার সম্ভাবনার দরজা, যা খুলে দেয় অনন্ত জ্ঞানের জগৎ।

আমার অভিজ্ঞতার গ্রন্থাগার:- আমি যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হই, তখনই গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ছোট ছোট রঙিন বই, গল্পের চরিত্র, রূপকথার রাজ্য, সবকিছুই যেন জীবন্ত হয়ে উঠত পৃষ্ঠা উল্টালেই। ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারি, গ্রন্থাগার শুধু বিনোদনের জায়গা নয়, বরং এক বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার ।

কলেজ জীবনে এসে আমি গ্রন্থাগারকে চিনেছি গবেষণার সহায়ক হিসাবে। নিরিবিলি পরিবেশ, সুবিন্যস্ত বইয়ের তাক, প্রাসঙ্গিক রেফারেন্স এবং গ্রন্থাগারিকের সহায়তা- সব মিলিয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

গ্রন্থাগারের ভূমিকা:- গ্রন্থাগার শিক্ষালাভের একটি অন্যতম উপায় এটি পাঠক্রমের বাইরে বই পড়ার সুযোগ করে দেয়। নানা বিষয়ের বই পড়ে একজন পাঠক ভাবনার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। বিশেষত সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস পাঠে চিন্তাশক্তি প্রখর হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণাপত্র, জার্নাল ও রেফারেন্স বই পাওয়া যায়, যা গবেষককে সাহায্য করে কমিউনিটি লাইব্রেরি বা চলমান গ্রন্থাগার গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষা ছড়াতে ভূমিকা রাখে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক পড়ে, পাঠক বিনোদনও পায়। এটি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

গ্রন্থাগারের কার্যপদ্ধতি :- একটি আদর্শ গ্রন্থাগারে যা যা থাকা প্রয়োজন -

বই সংগ্রহ- পাঠ্যবই, সহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, জীবনী, অভিধান, রেফারেন্স, গবেষণাপত্র প্রভৃতি ।

পাঠক কক্ষ :- পাঠকদের বসে পড়ার উপযোগী, নীরব, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ।

পত্র পত্রিকা বিভাগ :- দৈনিক সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকার সংগ্রহ ।

রেফারেন্স বিভাগ :- এমন বই যা কেবল গ্রন্থাগারের ভিতরে ব্যবহার করা যায়।

ডিজিটাল বিভাগ :- ই-বুক, অনলাইন জার্নাল, ই-লাইব্রেরী ও ইনটারনেট সুবিধাযুক্ত কম্পিউটার।

লাইব্রেরিয়ান :- যিনি লাইব্রেরী পরিচালনা করেন ও পাঠকদের সাহায্য করেন।

এইসব বিভাগ একটি লাইব্রেরীকে পূর্ণতা দেয় এবং পাঠকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।

গ্রন্থাগার ও সমাজ :- একটি গ্রন্থাগার একটি সমাজকে সচেতন, শিক্ষিত ও মানবিক করে তোলে। নিম্নবিত্ত ছাত্র ছাত্রী, প্রবীণ নাগরিক, গৃহবধূ, বেকার যুবক, সবাই লাইব্রেরীর উপকার পেতে পারেন। একটি গ্রন্থাগার মানে একটি শিক্ষাকেন্দ্র, একটি গণতান্ত্রিক মঞ্চ এবং একটি ভাবনার জায়গা।

গ্রামীণ এলাকায় একটি চলমান গ্রন্থাগার বা মোবাইল লাইব্রেরী চালু হলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বস্তি এলাকায় শিশুদের জন্য ছোট লাইব্রেরী গড়ে তোলা যায় যাতে তারা পড়াশুনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। লাইব্রেরী সমাজ পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারের পরিবর্তন :- বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও রূপ নিচ্ছে ডিজিটাল গ্রন্থাগারে। ই - লাইব্রেরী , অনলাইন ক্যাটালগ, ডিজিটাল রিসোর্স, অডিও বুক,ই-বুক প্রভৃতি আধুনিক রুপে পাঠকের দরজায় পৌছে দিচ্ছে তথ্য। উদাহরণ স্বরূপ ''National Digital Library of India'' একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে হাজার হাজার বই ও গবেষণাপত্র অনলাইনে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

সমস্যাবলী ও সম্ভাবনা :

সমস্যা - অনেক গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত বই ও আর্থিক সংস্থান নেই।
ডিজিটাল অনভিজ্ঞতা বা সরঞ্জামের অভাবের কারণে অনেক পাঠক-ই লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারে না।
শিশু ও কিশোরদের মধ্যে গ্রন্থাগার বিমুখতা দিন দিন বাড়ছে।

সম্ভবনা - পাঠচক্র বই পড়া প্রতিযোগিতা ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে পাঠকদের উৎসাহিত করা যায়।
গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ানো যায়।
বিদ্যালয়ে নিয়মিত লাইব্রেরী ক্লাস বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

আমার চোখে গ্রন্থাগার হল একটি পবিত্র জ্ঞানমন্দির। এটি আমাদের চিন্তা, চেতনা ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আমরা যদি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি এবং গ্রন্থাগারকে জীবনের অংশ করে নিই, তবে জ্ঞানভিত্তিক একটি আলোকিত সমাজ গঠন সম্ভব। ডিজিটাল যুগে গ্রন্থাগারের নতুন রূপকে গ্রহণ করে, আমরা এক অনন্য জ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। তাই বলা যায়- ''গ্রন্থাগার শুধু বইয়ের ঘর নয়, এটি ভবিষ্যৎ নির্মাণের পাঠশালা''।

মানসিক বিকাশের উৎস বই

রূপসা খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার, ভূগোল বিভাগ

মানব সভ্যতার মাপকাঠির বড় উপাদান হল বই। তা কেবলমাত্র জ্ঞানের আধার নয় বরং মানব চেতনার ধারক ও বাহক, তবে এই বই হঠাৎ করে আর্বিভূত হয়নি এর আর্বিভাবের ইতিহাস স্পষ্টভাবে ইতিহাসের পাতায় লিখিত আছে। আদিতে মানুষ তাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ করত ইশারায় পরে সংকেতের মাধ্যমে বড়ো গুহার গায়ে বা বিশাল প্রস্তরে তারা খোদায় করে রেখেছে মনের বাসনাকে। পরবর্তীতে মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্যাপিরাস উদ্ভিদের ছাল দিয়ে তৈরি করা হলো এক ধরনের বিশেষ উপকরন। তারপর এল মুদ্রন যন্ত্র। তারও পরে এল বই। অন্যদিকে বেদ উপনিষদ পুরান তালপাতা ও তেজ পাতার, গাছের ছালে, লেখা হতো যা পুঁথি নামে পরিচিত। ১৪৪০ সালে জোহানেস গুটেনবার্গ সর্বপ্রথম ছাপাখানার আবিস্কার করেন। ফলে বই সকল স্তরের মানুষদের কাছে পৌছানোর পথ সুগম হয়।

বইপ্রেমি মানুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু হলো বই । এটি তাদের মধ্যে আনন্দ জ্ঞান অভিজ্ঞতা কল্পনা এককথায় বলতে গেলে বিভিন্ন রংবেরংয়ের অনুভূতিকে সজীব করে। বই পড়ার যে আনন্দ সেটা একমাত্র পাঠক হৃদয়ই অনুধাবন করতে পারে। বই সম্পর্কে বিশ্বকবির অভিব্যক্তি-

''বই ইচ্ছে অতীত আর
বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেওয়া সাঁকো।''

পেটের ক্ষিদের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, মনের নান্দনিকতার জন্য বই। আমাদের দেহ বা মন সমসময় ভালো থাকে না। অনেক সময় বিভিন্ন চিন্তাদায়ক বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে আর এই চিন্তার জন্য স্বাস্থ্যও তখন খারাপ হয়ে পড়ে। কথায় আছে মন ভালো তো সব ভালো, তবে মন খারাপ হয়ে পরলেই কোনো কিছু আর ভালো লাগেনা। আর এই সময় একটি বই-ই পারে মনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির সঞ্চার করে মনকে আনন্দে উৎফুল্ল করে রাখতে।

বই বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে- জ্ঞানমূলক, রসসাহিত্য এবং ধর্মীয় গ্রন্থ। তবে পাঠক হৃদয় সমসময় জ্ঞান বা ধর্মীয় বই পড়তে পছন্দ করে না বরং রসসাহিত্য পড়তেই বেশি পছন্দ করে কারন তা আনন্দদায়ক কারণ জ্ঞান পিপাসুর থেকে রসিক পাঠকের রসের পিপাসা

বেশি। বই হলো এমন একটি সম্পদ যার জ্যোতি চোখে দেখা যায় না তবুও জগৎকে এক অদৃশ্য আলোয় আলোকিত করে চলেছে অনন্তকাল ধরে। এই বইয়ের আবিষ্কার এবং বই পড়ার ফলে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার যা নারী জীবনকে বিধ্বস্থ করে চলছিল প্রতিনিয়ত তা চিরতরে দূরীভূত হয়েছে । নারী সমাজে নিজেদের প্রাপ্ত সম্মান পেয়েছে। যার মূল হল এই বই।

বই পড়ার অভ্যাস হচ্ছে এমন এক বিষয় যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেকার পথকে মসৃণ করে তোলে। আজ পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো যেসমস্ত কিছু হবে তার মূল কারিগর হল এই বই। যা পড়ে তার থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা দেখায় আমাদের আলোর দিশা।

বই পড়ার মাধ্যেমে নৈতিক চেতনা ও ভাষা গঠন সুন্দর হয়। বিভিন্ন বই যেমন কোরান, বাইবেল, গীতা, বিভিন্ন সাহিত্য, রামায়ন, মহাভারত থেকে আমরা ধর্মীয় জ্ঞানকে জানতে পারি, ধর্মের আসল সত্য সমাজের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চাইলে শুধু বই পড়লেই হবে না, বই পাঠের অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে তাহলেই সাফল্যের যে স্বাদ তা আমরা অনুভব করতে সক্ষম হবো। এই সম্পর্কে আমাদের দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি মাননীয় এ.পি.জে আব্দুল কালামের অভিব্যক্তি-

''বই পড়া তোমার ভবিষ্যৎ
গড়ার প্রথম ধাপ''

তবে সব শিক্ষা বই থেকে রপ্ত করা যায় না, পরিস্থিতি মানুষকে বড়ো শিক্ষা দেয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত প্রকৃতি আমাদেরকে বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকে। বই পড়ার মাধ্যমে আমরা যেমন জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়, ঠিক একইভাবে আমাদের বিশ্ববার্তার সন্ধান দেয়। সম্মান প্রদান করা বিভিন্ন বিষয় পরিবার ও পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকি। এছাড়াও প্রকৃতির বুকে বসবাস করা বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রানী, কীটপতঙ্গ এবং জল, বায়ু, মাটি এই সমস্ত কিছুর বৈশিষ্ট্য যদি আমরা ভালোভাবে অনুধাবন করে থাকি তহলে দেখা যবে এই প্রত্যেকটি বিষয় কোনো না কোনো ভাবে আমাদের শিক্ষা প্রদান করে। তাই শুধুমাত্র বই পড়ার মাধ্যমেই সমস্ত শিক্ষা আমরা রপ্ত করি । এই কথাটা ঠিক নয়। বই পড়ার পাশাপাশি আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকেও শিক্ষা পাই। তথাপি এটা আমরা বলব যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে যে

জ্ঞান অর্জন করি তা সবসময় সবার দ্বারা হয়না, আমরা এই জ্ঞান অনেকাংশে বই পড়ার মাধ্যমে জানতে পারি।

মানব সভ্যতার অগ্রগতির চরম শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা সত্যি বলতে বই পড়ার অভ্যাসটা যেনো কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের জীবন এখন অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। যেকোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমরা নিজের জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর পরিবর্তে অপরের সহযোগিতা পাওয়ার আশায় ব্যস্ত। এখানে অপর বলতে বিভিন্ন মেসিন যেমন মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ সর্বোপরি বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনকে বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান তো অবশ্যই করে ফেলছি, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এক নিমেষের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ একদম হচ্ছে না। অর্থাৎ আমরা প্রকৃত যে জ্ঞান তা অনুধাবন করতে অক্ষম, কারন সেটা শুধু বই পড়ার মাধ্যমেই পাওয়া যায়, অন্য কোনো মাধ্যমে ভালোভাবে হয় না।

আমাদের জীবন এখন অনেক এগিয়ে, আমরা এখন চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে আমাদের যন্ত্র পাঠাতে সক্ষম হয়েছি, অনেক আধুনিক জিনিস তৈরি করেছি দেশের সুরক্ষার্থে এবং অতি বিস্ময়কর জিনিস আমরা আবিষ্কার করেছি, কিন্তু এর প্রত্যেকটা সূত্র কোনো না কোনো ভাবে বই থেকেই প্রাপ্ত। সেহেতু আমরা যে সমস্ত বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীদের অনুসরন করে থাকি, তাদের জীবন বৃতান্ত পাঠ করলেই তথ্য পাওয়া যাবে যে তাদের এই সাফল্যমন্ডিত জীবনের পিছনে বই ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

তাই আমি বর্তমান দিনের সমস্ত আধুনিক শিক্ষার্থীদের কাছে একটাই অনুরোধ করব যে যুগ যতই আধুনিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হোক না কেন, সময় পেলে সবার এই বই পড়া খুবই দরকার, তাহলেই প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে সক্ষম হবে এবং জীবনে আরো অগ্রসর হতে পারবে।

বর্তমান যুগের সবথেকে বড়ো বিষয় হচ্ছে মোবাইল, এখন পড়ার জন্য বইও ফোনের বিভিন্ন অ্যাপস পাওয়া যায়, তাই আজ ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের প্রতি আকর্ষন অনেক কম। তবে মোবাইলের সীমিত জ্ঞান কখনোই সাফল্যের শিখরে পৌছাতে পারে না, যদি জীবন গড়তে হয়, সাফল্য অর্জন করতে হয়, তাহলে নিয়ম মতো নিজের দরকারে ফোন ব্যবহার অপরদিকে জীবন গঠন করতে বই হাতে তুলে বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে তাহলেই সাফল্য নিশ্চিত।

মনন চর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ বই

সাবানা ইয়াসমিন
তৃতীয় সেমিষ্টার, ইংরাজী বিভাগ

মানবজীবনের উন্নতির মূল ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষা, আর সেই শিক্ষার প্রধান উৎস হল বই। বই কেবল তথ্য দেয় না, বরং মানুষের মনন, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা এবং চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর যেকোনো বরেণ্য মানুষের জীবন ইতিহাস ঘাঁটলেই এ কথার সত্যতা লক্ষণীয় যে তাঁরা জ্ঞান অন্বেষণের চেয়ে মানসিক বিকাশের জন্য বইকে বেশি বেশি সময় দিয়েছেন। একটি ভালো বই মানুষের অন্তরকে শুদ্ধ করে এবং চিন্তার জগৎকে প্রসার করে। গল্প, উপন্যাস, জীবনী, বিজ্ঞান, ইতিহাস - প্রতিটি বিষয়ের বই আমাদের জ্ঞানসম্ভারকে এবং মনকে সমৃদ্ধশীল করে।

মানব জীবনে বইয়ের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে টলস্টয় বলেছেন, জীবনে মাত্র তিনটে জিনিসের প্রয়োজন। বই বই এবং বই, তাই প্রথম চৌধুরী যথার্থই বলেছেন -

বীনা ও পুস্তক দুই-ই সরস্বতীর দান হলেও ও-দুটি গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীনা বাজানোর অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এযুগের সকল সভ্য দেশেরই আছে এক্ষেত্রে আমার দেশ ব্যতিক্রম নয়।

আধুনিককালে যান্ত্রিকতা যতই মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে ততই বই পড়া তথা কাব্যচর্চার গুরুত্ব বাড়ছে। কাব্যচর্চা না করলে বই না পড়লে মানুষ তার জীবনে একটা বড়ো আনন্দ থেকে বিচ্যুত হয়। অথচ বই পড়ার মধ্যে যে আনন্দের ভাণ্ডার রয়েছে, তা সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে।

আনন্দলাভ সব মানুষের কাছে কাঙ্খিত, তাই বই পড়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে, তা পাঠের মাধ্যমেই উপলব্ধি সম্ভব।

বই কেবল পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের কাজ করে।

বই হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা পড়ার ফলে মানুষের শব্দভাণ্ডার বাড়ে এবং লেখার ও কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

মানুষের জীবনে কেবল ভৌত সাফল্যের উপর নির্ভরশীল নয়। মানসিক শান্তি, নৈতিক দৃঢ়তা, মানসিক মূল্যবোধ-এসব মিলেই প্রকৃত জীবন গড়ে ওঠে। আর এই সবকিছুর মূল উৎস হলো পঠন-পাঠন। বই ছাড়া মানুষের চিন্তা-চেতনার জগৎ অপূর্ণ থাকে। বই শুধু ব্যক্তি জীবন নয়, সমগ্র সমাজকেও গড়ে তোলে। শিক্ষিত সমাজ মানেই উন্নত সমাজ, আর শিক্ষার মূলভিত্তি বই। বই মানুষকে সভ্য করেছে, দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা শিক্ষিয়েছে, সাম্যের বাণী ছড়িয়েছে। বাংলা রেনেসাঁর লেখা বই আমাদের সমাজকে নতুন পথে চালিত করছে।

প্রমথ চৌধুরী যথার্থ বলেছেন - 'সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্ব প্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজারদর নেই। জ্ঞানের ভাণ্ডার সে ধণের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ, কিন্ত সমান প্রত্যক্ষ নাহলেও এও সমান সত্য যে এযুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধণের ভাঁড়েও ভবানী। সুতরাং ধণের ভাণ্ডারকে উৎসাহিত করতে হলে বই পড়া যে জরুরি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। বই পড়লে কত অজানা তথ্য, নীতিজ্ঞান, বাস্তবজ্ঞান আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। এমনকি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করে বই। ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মার্কশীট রচনা করে। ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান জীবনের নানা রসদ এবং আগামী দিনের পথ পরিক্রমার পথ নির্ণীত হয় পাঠের মাধ্যমে। বিশেষ করে স্বাধীন পাঠ-কল্পনাবৃত্তির প্রসার ঘটায়। এই কল্পনাবৃত্তি জীবনে বাঁচার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন।

বাস্তবিক কথা হল, আমরা নিজেদেরকে সভ্য নাগরিক প্রতিপন্ন করতে চেয়ে বইও সৌখিন আলমারিতে সাজিয়ে রাখি। কিন্ত বই সেভাবে পড়ে নিজেদেরকে সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তোলায় আমরা উৎসাহ অনুভব করিনা। তার অন্যতম কারণ আমরা শ্রমবিমুখ। সেজন্য পরিশ্রম করে বই পড়ি না, পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি না। বাহ্যিক দিক থেকে আমরা সভ্য হলেও অন্তরে আমরা দেউলিয়া হয়ে পড়েছি। সেই দেউলিয়া সরিয়ে বই পড়াকে জীবনের অঙ্গ ও শিক্ষা উভয় দিক থেকে গ্রহণ করলে ব্যক্তি ও জাতির উন্নতির পথ প্রসস্থ হবে।

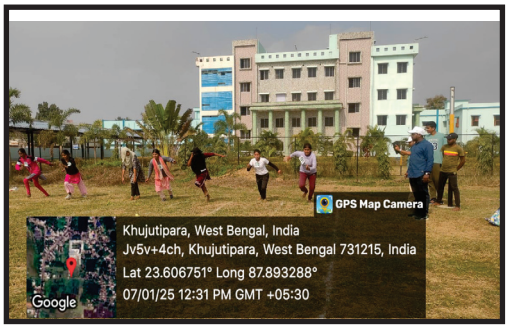












ANNUAL COLLEGE SPORTS 2024-2025

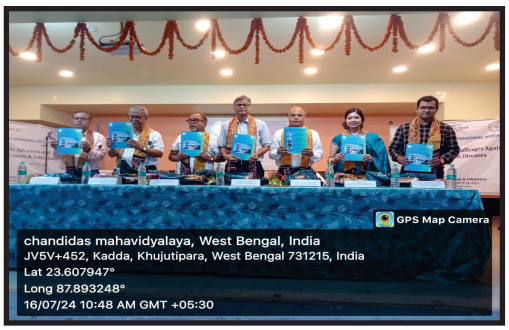
















SOME GLIMSES OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2024-2025





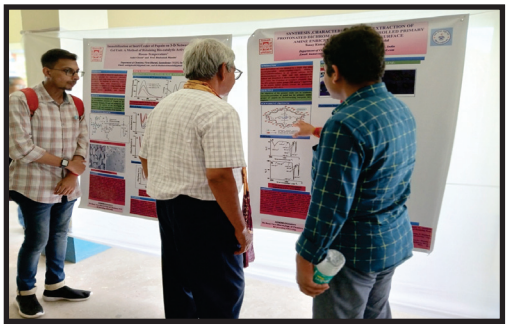








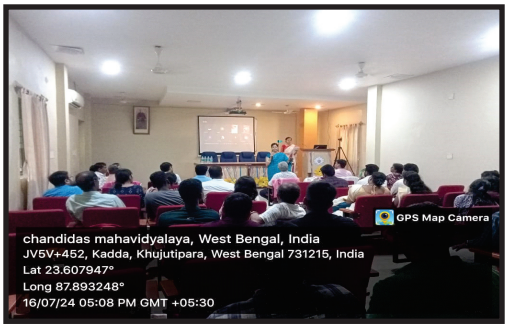




SOME GLIMSES OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2024-2025











SOME GLIMSES OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2024-2025







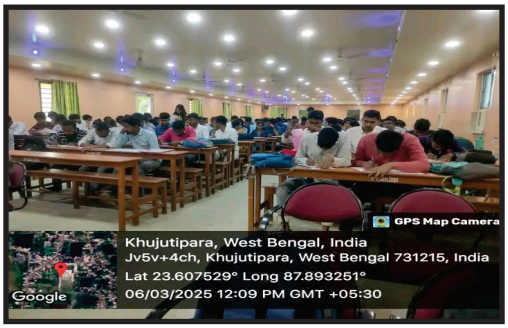


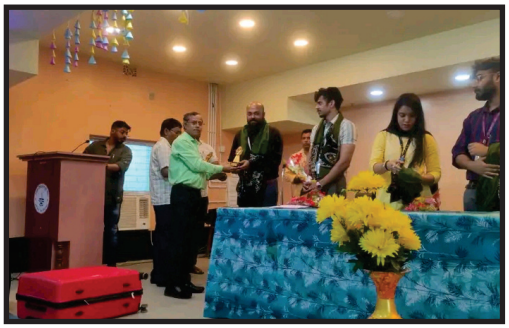


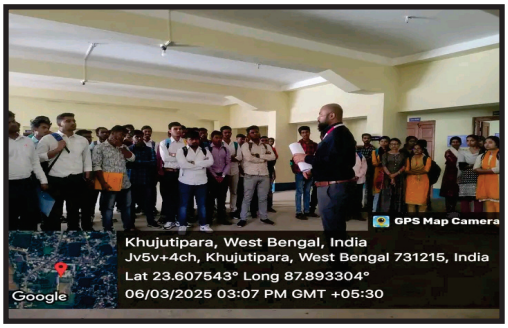




EXHIBITION CUM FAIR 2024-2025

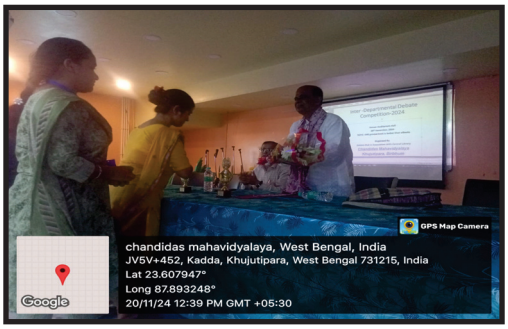








TATA CONSULTANCY SERVICES RECRUITMENT 2024-2025

















SOME GLIMPSES OF THE INTER DEPARTMENTAL DEBATE COMPETITION HELD ON 20-11-2024

















SOME GLIMPSES OF THE INTER DEPARTMENTAL DEBATE COMPETITION HELD ON 20-11-2024

















SOME GLIMPSES OF THE INTER DEPARTMENTAL DEBATE COMPETITION HELD ON 20-11-2024





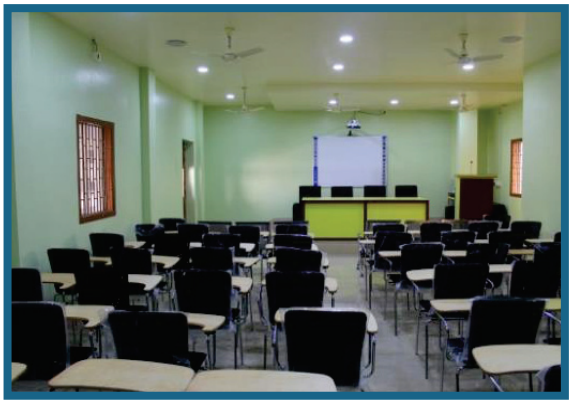




SOME GLIMPSES OF THE INTER DEPARTMENTAL DEBATE COMPETITION HELD ON 20-11-2024









ICT- BASED CLASS ROOM









NSS ACTIVITIES 2024-2025









NCC ACTIVITIES 2024-2025

Design & Printed By : R.B. Lamination 98366 83900